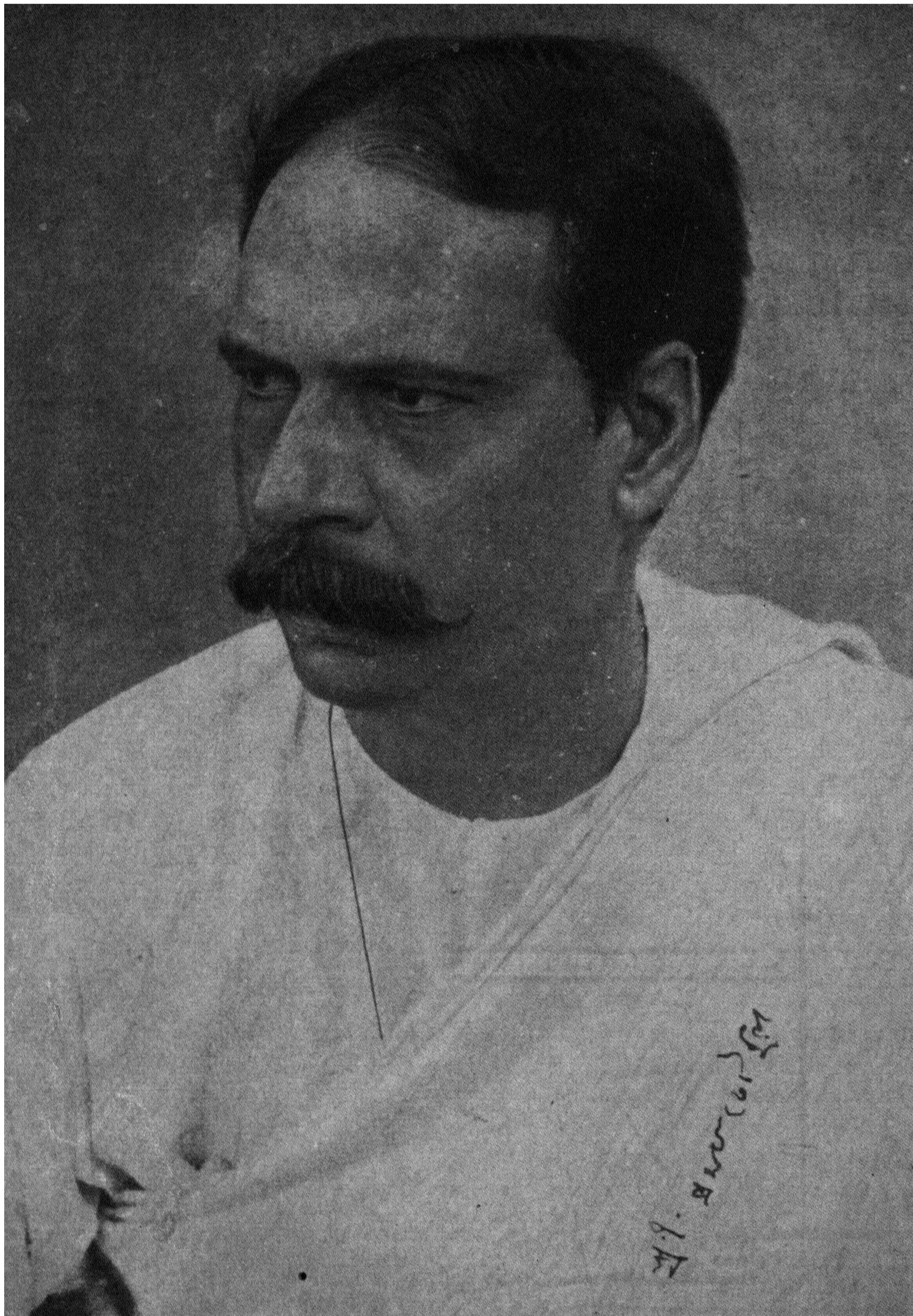
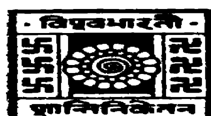


প্রমথ চৌধুরী   ৭ অগস্ট ১৮৬৮ - ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

সনেট-পঞ্চাশৎ

ও অন্যান্য কবিতা

প্রমথ চৌধুরী



বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সম্পাদিত

সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা - প্রকাশ ৭ আশ্বিন ১৩৫৯

প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীসত্যজিৎ রায়

প্রকাশক রণজিৎ রায়

বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার

শ্রীগোপাল প্রেস। ১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলিকাতা ৪

২.১

গ্রন্থসূচী

কবিতা-সূচী

সনেট-পঞ্চাশৎ

কবিতা-সূচী

কবিতা-সূচী

পদচারণ

গান

আমি যদি চাই আলো, তবে নাহি তার দেখা;
আঁধারে ঘরে।
তবু আমি এক পাশে আলোক জীবনে মাঝে
অন্ধ ঘরে ঢেকে॥
মাঝে তবু আলো নিয়ে দিও কোন পথে দিয়ে
সমীর অসীমে।
যত কিছু লেখালেখি – সব যদি সত্য
মাটিতে মিলায়॥

শ্রী প্রমথ চৌধুরী

সনেট-পঞ্চাশৎ

সনেট

পেত্রার্কা-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্যে সনেটে সাকার।
একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,
গুরুশিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ!

নীরব কবিও ভালো, মন্দ শুধু অন্ধ।
বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার,
তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার,
এ কথা পণ্ডিতে বোঝে, মূর্খে লাগে ধন্ধ॥

ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন॥

ইতালির ছাঁচে ঢেলে বাঙালির ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ—
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট!

৯ সেপ্টেম্বর ১৯১২

ভাস

পদধূলি দেহো মোরে, মহাকবি ভাস!
ভারতের নাটকের আদিম আচার্য!
ধন্য হব তব কাব্য করি শিরোধার্য,
পত্রে পত্রে স্ফুরে যার বালার্ক-আভাস॥

শুদ্ধ সুরে গেয়েছিলে প্রসন্ন-বিভাস,
পরিষদ ছিল তব মহাপ্রাণ আর্য।
সে যুগের কবিমুখে ছিল না উচ্চার্য
বৃন্দাবনী প্রণয়ের গদগদ ভাষ॥

স্বাধ্যায়-পবিত্র তব শূর-মুখ-বাণী।
সরাগিণী অরোগিণী তব বীণাপাণি॥

তব কাব্য গৌরবের ধরে ইতিহাস।
তুমি জান' সমরস বীর ও করুণ।
সে শুধু কাতর, যার নয়নে বরুণ।
তোমার নাটকে তাই জ্বলে পরিহাস॥

৯ জানুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

জয়দেব

ললিত লবঙ্গলতা দুলায় পবনে।
বর্ণে গন্ধে মাখামাখি, বসন্তে অনঙ্গে।
নূপুর-ঝংকারে আর গীতের তরঙ্গে,
ইন্দ্রিয় অবশ হয় তব কুঞ্জবনে॥

উন্মদ মদনরাগ জাগালে যৌবনে,
রতিমন্ত্রে কবিগুরু দীক্ষা দিলে বঙ্গে।
রণক্ষত-চিহ্ন তাই অবলার অঙ্গে,
পৌরুষের পরিচয় আশ্লেষে চুম্বনে॥

পাণির চাতুরী হল নীবীর মোচন।
বাণীর চাতুরী কান্ত কোমল বচন॥

আদিরসে দেশ ভাসে, অজয়ে জোয়ার!
ডাক' কল্কি, ম্লেচ্ছ আসে, করে করবাল,
ধূমকেতু-কেতু সম উজ্জ্বল করাল,
বঙ্গভূমি পদে দলে তুরুষ্ক সোয়ার!

৭ সেপ্টেম্বর ১৯১২

ভর্তৃহরি

যোগী তুমি, ভোগী তুমি, তুমি রাজকবি।
দেখেছ কখনো বিশ্ব শুধু নারীময়,
আবার দেখেছ বিশ্ব শুধু ব্রহ্মময়,
সুবর্ণে গৈরিকে আঁক' সেই দুই ছবি ॥

ক্ষণিকের জ্যোতিকণা জান' শশিরবি,
বিশ্বরূপে মুগ্ধ তবু, সৌন্দর্যে তন্ময়।
অসীম আঁধার-মগ্ন অনন্ত সময়
আত্মজ্যোতি-দীপালোকে শূন্য দেখ সবি।

নাস্তিকের শিরোমণি, আস্তিকের রাজা!
তব ধর্ম মনোরাজ্যে বহুরূপী সাজা ॥

নাহি জান' কারে বলে ভয় কিম্বা আশা।
ভুক্তি মুক্তি তোমা কাছে সমান অসার।
সত্য শুধু মানবের অনন্ত পিপাসা—
রত্ন দিয়ে তাই গাঁথ' বৈরাগ্যের হার!

৬ সেপ্টেম্বর ১৯১২

চোরকবি

জ্বলন্ত অঙ্গার, চোর! তোর প্রতি শ্লোক,
দেহ আর মন যাহে একত্র গলিয়া,
হয়েছে পুষ্পিত; রূপে মর্ত্য উজলিয়া—
কামনার অগ্নিবর্ণ রক্তাক্ত অশোক!
অশুভদর্শন যার কুহকী আলোক,
চিতাগ্নির শিখাসম হুতাশে জ্বলিয়া,
মরণের ধূম্রদেহ চরণে দলিয়া,
রক্তসন্ধ্যারূপে রাজে, ছেয়ে কাব্যলোক॥

সেই রক্তপুষ্পে করি শক্তি-আরাধনা,
করেছিলে মশানেতে নায়িকা-সাধন।
দিয়েছিল দেখা বিশ্ব বিদ্যারূপ ধরি,
কনকচম্পকদামে সর্বাঙ্গ আবরি,
সুপ্তোত্থিতা, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরী,
প্রমাদের রাশিসম অবিদ্যা-সুন্দরী!

২৭ জানুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

বসন্তসেনা

তুমি নও রত্নাবলী, কিম্বা মালবিকা,
রাজোদ্যানে বৃন্তচ্যুত শুভ্র শেফালিকা।
অনাঘ্রাত পুষ্প নও, আশ্রমবালিকা—
বিলাসের পণ্য ছিলে, ফুলের মালিকা॥

রঙ্গালয় নয় তব পুষ্পের বাটিকা,
অভিনয় কর নাই প্রণয়-নাটিকা।
তব আলো ঘিরে ছিল পাপ-কুজ্ঝটিকা—
ধরণী জেনেছ তুমি মৃৎ-শকটিকা!

নিষ্কণ্টক ফুলশরে হও নি ব্যথিতা।
বরেছিলে শরশয্যা, ধরায় পতিতা॥

কলঙ্কিত দেহে তব সাবিত্রীর মন
সারানিশি জেগে ছিল, করিয়ে প্রতীক্ষা
বিশ্বজয়ী প্রণয়ের, প্রাণ যার পণ।—
তারি বলে সহ তুমি অগ্নির পরীক্ষা!

১৩ নবেম্বর ১৯১২
১৯ স্টোর রোড। বালিগঞ্জ

পত্রলেখা

অষ্টাদশ বর্ষ দেশে আছ পত্রলেখা !
শুক-মুখে শুনিয়াছি তোমার সন্দেশ।
তাম্বূল-করঙ্ক করে, রক্ত পট্টবেশ,
প্রগল্‌ভ বচন, রাজ-অন্তঃপুরে শেখা ॥

কাব্য-রাজ্যে তব সনে নিমেষের দেখা।
সুবর্ণ-মেখলা-স্পর্শী মুক্ত তব কেশ—
অশ্বপৃষ্ঠে রাজপুত্র যায় দূর দেশ,
অঙ্কে তার আঁকা তুমি বিদ্যুতের রেখা !

চন্দ্রাপীড় মুগ্ধনেত্রে হেরে কাদম্বরী—
রক্তাম্বরে রাখ' তুমি হৃদয় সম্বরি ॥

গিরি পুরী লঙ্ঘি, সিন্ধু কান্তার বিজন,
মনোরথে নীলাম্বরে ভ্রমি যবে একা—
মম অঙ্কে এসে বস', কবির সৃজন,
তাম্বূল-করঙ্ক করে তুমি পত্রলেখা !

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১২

তাজমহল

শাজাহাঁর শুভ্রকীর্তি, অটল সুন্দর !
অক্ষুণ্ণ অজর দেহ মর্মরে রচিত,
নীলা পান্না পোখ্‌রাজে অন্তর খচিত।
তুমি হাস', কোথা আজ দারা সেকন্দর ?

সকলি সদর তব, নাহিকো অন্দর,
ব্যক্ত রূপ স্তরে স্তরে রয়েছে সঞ্চিত।
প্রেমের রহস্যে কিন্তু একান্ত বঞ্চিত,
ছায়ামায়াশূন্য তব হৃদয়-কন্দর !

মুম্‌তাজ ! তাজ নহে বেদনার মূর্তি।
—শিল্প-সৃষ্টি-আনন্দের অকুণ্ঠিত স্ফূর্তি ॥

আঁখিতে সুর্‌মা-রেখা, অধরে তাম্বূল,
হেনায় রঞ্জিত তব নখাগ্র রাতুল,
জরিতে জড়িত বেণী, রুমালে স্তাম্বুল—
বাদ্‌শার ছিলে তুমি খেলার পুতুল !

৬ অক্টোবর ১৯১২
S. S. Garhwali
on the Jumna

বাংলার যমুনা

তুমি নহ শ্যামা তন্বী বৃন্দাবন-পাশে,
তীরে যার সারি সারি কদম্ব বকুল,
কৃষ্ণ যেথা বেণুতানে মাতায় গোকুল,
নৃত্য করে লীলাভরে গোপীসনে রাসে

উজান বহ না তুমি চলিয়া বিলাসে—
সুমুখে ছুটিয়া চল উদ্দাম ব্যাকুল,
মাটি নিয়ে খেলা কর ভেঙে দুটি কূল,
সীমায় আবদ্ধ নহ, পরশ' আকাশে !

আরম্ভেতে ব্রহ্মপুত্র, শেষেতে যমুনা।
সৃষ্টি আর প্রলয়ের দেখাও নমুনা॥

অহর্নিশি ভাঙাগড়া, এই তব রীতি,
মুক্তকণ্ঠে গাও তুমি জীবনের গান।
জগৎ গতির লীলা, সৃষ্টিছাড়া স্থিতি।
বাংলার নদী তুমি, বাংলার প্রাণ !

৮ অক্টোবর ১৯১২
S. S. Garhwali
Brahmaputra

বার্নার্ড্ শ

সভ্যতার প্রিয়শত্রু, বার্নার্ড্ শ,
সমাজের তুমি দেখ শৃঙ্খল আচার,
শিকল-বিকল-মন মানুষ নাচার,
তব শাস্ত্র শুনে তাই তারা হয় থ !

মানুষেতে ভালোবাসে হ য ব র ল,
তারি লাগি সয় তারা শত অত্যাচার।
স্পষ্ট বাক্যে প্রাণ পায়, যে করে বিচার—
অন্যের পায়ের নীচে প'ড়ে যায় দ !

মানবের দুঃখে মনে অশ্রুজলে ভাস'—
অপরে বোঝে না, তাই নাটকেতে হাস' ॥

হয় মোরা মিছে খেটে হই গলদ্‌ঘর্ম,
নয় থাকি বসে, রাখি করেতে চিবুক।
এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক !

১২ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

বালিকা–বধূ

বাংলার যত নব যুবা কবিবঁধু,
যুবতী ছাড়িয়ে এবে ভজিছে বালিকা।
তাদের চাপিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়-নালিকা,
চোঁয়াতে প্রয়াস পায় তাজা-প্রেম-মধু !

গৌরীদানে লভে কবি কচিখুকি বধূ,
কবিহস্তে কিন্তু ত্রাণ পায় না কলিকা।
কুঁড়ি ছিঁড়ি ভরে তারা কাব্যের ডালিকা-
দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখে যাচে শীধু !

পবিত্র কবিত্বপূর্ণ প্রেমে হয়ে ভোর,
বালিকার বিদ্যালয়ে ঢোকে কবি-চোর !

বলিহারি কবি-ভর্তা এম. এ. আর বি. এ.
বাল-বধূ-লতিকার ঝুলিবার তরু !
মানুষ মরুক সবে গলে রজ্জু দিয়ে,
বেঁচে থাক্ কবিতার যত কাম-গোরু !

[? ডিসেম্বর ১৯১২]

বন্ধুর প্রতি

বড়ো সাধ ছিল তব, করে ধরি বীণ,
বাজাতে অপূর্ব রাগ যৌবনের সুরে,
মুমূর্ষু মুমুক্ষু সবে দিয়ে যমপুরে,
তব গীতমন্ত্রে ধরা করিতে নবীন !

কল্পনার ছিল তব চক্ষে দূরবীন।
অসীম আকাশদেশে দূর হতে দূরে
খুঁজিতে কোথায় কোন্ নব জ্যোতি স্ফুরে,
যার আলো জয় করে আঁধার প্রবীণ ॥

আবিষ্কার কর নাই কোনো নব তারা।
আজিও ধরণী ধরে পুরানো চেহারা ॥

আকাশেতে উড়েছিলে রঙিন পতঙ্গ,
পূর্বাহ্নেই গেছে তব পাখা দুটি ঝরে,
সে পক্ষধূনন-ধ্বনি আজ গেছে মরে—
মাটির বুকেতে সুখে শুয়ে আছে অঙ্গ !

৮ জানুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

ব্যর্থ জীবন

মুখস্থে প্রথম কভু হই নি কেলাসে।
হৃদয় ভাঙে নি মোর কৈশোর-পরশে।
কবিতা লিখি নি কভু সাধু-আদিরসে।
যৌবন-জোয়ারে ভেসে, ডুবি নি বিলাসে॥

চাটুপটু বক্তা নহি, বড়ো এজ্‌লাসে।
উদ্ধার করি নি দেশ, টানিয়া চরসে।
পুত্রকন্যা হয় নাই বরষে বরষে।
অশ্রুপাত করি নাই মদের গেলাসে!

পয়সা করি নি আমি, পাই নি খেতাব।
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখি নি কেতাব॥

অন্যে কভু দিই নাই নীতি-উপদেশ।
চরিত্রে দৃষ্টান্ত নহি, দেশে কি বিদেশে।
বুদ্ধি তবু নাহি পাকে, পাকে যদি কেশ।
তপস্বী হব না আমি জীবনের শেষে!

২১ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

মানব-সমাজ

ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত মানব-সমাজ।
মাটির প্রদীপ জ্বেলে সারানিশি জাগে,
ছোটো ঘরে দোর দিয়ে ছোটো সুখ মাগে,
সাধ ক'রে গায়ে পরে পুতুলের সাজ॥

কেনা আর বেচা, আর যত নিত্য কাজ,
চিরদিন প্রতিদিন ভালো নাহি লাগে।
আর কিছু আছে কি না, পরে কিম্বা আগে,
জানিতে বাসনা মোর মনে জাগে আজ॥

বাহিরের দিকে মন যাহার প্রবণ—
সে জানে প্রাণের চেয়ে অধিক জীবন॥

মন তার যায় তাই সীমানা ছাড়িয়ে,
করিতে অজানা দেশ খুঁজে আবিষ্কার।
দিয়ে কিন্তু মানবের সাম্রাজ্য বাড়িয়ে,
সমাজের তিরস্কার পায় পুরস্কার!

২৫ জানুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

হাসি ও কান্না

সত্য কথা বলি, আমি ভালো নাহি বাসি
দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল,
কথায় কথায় যাহে ভরে আসে জল—
আমি খুঁজি চোখে চোখে আনন্দের হাসি ॥

আর আমি ভালোবাসি বিদ্রূপের হাসি,
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্মম অনল
দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাশি ॥

হৃদয়ে কৃপণ হয়ে ধনী হতে চায়—
সুখ তারা দেয় নাকো, তাই দুঃখ পায় ॥

তাই আমি নাহি করি দুঃখেতে মমতা,
সুখী যারা, তারা মোর মনের মানুষ।
হাসিতে উড়ায় তারা নিষ্ঠুর ক্ষমতা,
মনে জেনে বিশ্ব শুধু রঙিন ফানুস ॥

২৩ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

ধরণী

কে বলে পৃথিবী এবে হয়েছে প্রাচীন ?
আজিও বসন্তে এসে কোকিল পাপিয়া
মুক্তকণ্ঠে তারস্বরে ডাকে পিয়া পিয়া—
বার্ধক্যের পক্ষে সে তো নহে সমীচীন !
বার্ধক্যের স্বপ্ন দেখে যত অর্বাচীন,
যৌবন যাহারা রাখে ভয়েতে চাপিয়া।
হ্যা দেখ, প্রাণের টানে উঠেছে কাঁপিয়া
চিরকেলে গুলিখোর পাণ্ডুবর্ণ চীন !

আকাশে বিদ্যুৎ আজো খেলে তলোয়ার,
চাঁদের চুম্বনে ওঠে সাগরে জোয়ার।
পূর্ণিমা আজিও ঘুরে আসে পক্ষে পক্ষে,
আজিও প্রকৃতি আছে সবুজ, শৌখিন।
নরনারী আজো ধরে পরস্পরে বক্ষে—
অমানুষে পরে শুধু ডোর ও কৌপীন !

২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

কাঁঠালী চাঁপা

গড়নে গহনা বটে, রঙেতে সবুজ—
ফুলের সবর্ণ নহ, বর্ণচোরা চাঁপা!
বৃথা তব গন্ধভারে গর্বভরে কাঁপা!
ফিরেও চাহে না তোমা নয়ন অবুঝ ॥

নেত্রধর্ম খুঁজে ফেরা গোলাপ, অম্বুজ।
উপেক্ষিতা আছ তুমি, হয়ে পাতা-চাপা।
তোমার কাঁঠালী গন্ধ নাহি রহে ছাপা—
ছুটে আসে, ভেদ করি পাতার গম্বুজ ॥

ঠিক ক'রে হও নাই পাতা কিম্বা ফুল—
দু'মনা করাই তব দুর্গতির মূল!

পত্রের নিয়েছ বর্ণ, ফল হতে গন্ধ,
আকৃতি ফুলের কাছে করিয়াছ ধার।
সর্বধর্মসমন্বয়-লোভে হয়ে অন্ধ—
স্বধর্ম হারিয়ে হলে সর্বজাতি-বার!

২৬ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

২

করবী

সুপ্ত গন্ধ, গুপ্ত বর্ণ তোমার, করবি !
শক্তি-বীজ-মন্ত্র আমি দিয়া তব কানে,
সৌরভ জাগাতে চাহি প্রণয়ের টানে,
গৌরবে তোমায় করি ফুলের ভারবি !

তরুণ-অরুণ-রাগে রঞ্জিত ভৈরবী,
জীবনের পূর্বরাগ আছে তার গানে।
সেই রাগ পূর্ণ হয় সারঙ্গের তানে,
আলিঙ্গন করে যবে মধ্যাহ্নের রবি ॥

পূর্ণস্নেহে জ্বলে যবে জীবনের শিখা,
গাঢ় হয়ে ওঠে তবে, ছিল যাহা ফিকা ॥

কত বর্ণ, কত গন্ধ অন্তঃপুরবাসী,
সুষুপ্ত রয়েছে আজি কুসুম-শয়নে।
জাগাতে তাদের নিত্য আমি ভালোবাসি,
তন্দ্রাসুখে আছে যারা মুদিয়া নয়নে ॥

২২ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

কাঠ-মল্লিকা

তুমি নহ রক্তজবা অথবা পলাশ,
আগুন জ্বালিয়ে বন আলো করে যারা,
—যে দিব্য অনলে পুড়ে কাম অঙ্গহারা,
যে আলো ধরায় করে নকল-কৈলাস!

তুমি নহ মানবের নয়ন-বিলাস,
রতি-ভর তনু তব হিমবিন্দু-পারা—
গন্ধ তব ভেদ করি শ্যামপত্র-কারা,
মুক্ত হয়ে ব্যক্ত করে মন-অভিলাষ॥

গুপ্ত হয়ে থাক' তুমি বন-অন্তঃপুরে।
মায়া তব গন্ধরূপে ছড়াও সুদূরে॥

আকাশ দেখ নি কভু সুনীল বিপুল,
ঘনচ্ছায় বনে আছ, নেত্র নত করি।
খুঁজি নি তোমায় আমি গন্ধসূত্র ধরি,
তাই তুমি মোর চির আকাশের ফুল!

১৮ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

রজনীগন্ধা

রাত্রি-হাতে সঁপে দেয় দিবা যবে সন্ধ্যা,
পরায়ে তাহার অঙ্গে গাঢ় লাল আলো,
—নিশা যারে ক্রোড়ে ধরে দিয়া বাহু কালো-
সেই লগ্নে ফোট' তুমি, রে রজনীগন্ধা !

রাত্রির পরশে যবে পৃথ্বী হয়ে বন্ধ্যা,
না পারে ফুটাতে ফুল রূপে জমকালো,
তুমি সেই অবসরে বুক খুলে ঢাল',
গোপনে সঞ্চিত গন্ধ, লো রজনীগন্ধা !

দিবসের প্রলোভনে তুমি নহ বশ্যা।
হৃদয় তোমার তাই অসূর্য্যম্পশ্যা॥

আমার আসিবে যবে জীবনের সন্ধ্যা,
দিবসের আলো যবে ক্রমে হবে ঘোর,
কানেতে পশিবে নাকো পৃথিবীর সোর,
মোর পাশে ফুটো তুমি, হে রজনীগন্ধা !

২৩ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

গোলাপ

রূপে গন্ধে মানি তুমি জগতে অতুল,
পূজায় লাগ' না কিন্তু, অনার্য গোলাপ !
দেমাকে দেবতাসনে কর না আলাপ—
ফুলের নবাব তুমি, নবাবের ফুল !

ইরানের ভগ্নোদ্যানে বসি বুলবুল,
স্মরিয়া স্মরিয়া তোমা করিছে বিলাপ।
তুমি কিন্তু রমণীর কেশের কলাপ
আলো ক'রে বস', কিম্বা কর্ণে হও দুল ॥

সোহাগে গলিয়া তুমি হও বা আতর,
গুম্ফাসনে ব'সে কর বেগম কাতর !

বিলাসের অঙ্গ লাগি তুমি হও জল,
নারীর আদুরে ফুল, শৌখিন গোলাপ !
নবাবেরই ভোগ্য তব রূপগুণবল,
নবাবের যোগ্য তুমি হকিমী জোলাপ !

২৩ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

ধুতুরার ফুল

ভালো আমি নাহি বাসি নামজাদা ফুল—
নারীর আদর পেয়ে যারা হয় ধন্য,
ফুলের বাজারে যারা হইয়াছে পণ্য,
কবিরা যাদের নিয়ে করে হুলস্থূল।
বিলাসীর কিন্তু যারা অতি চক্ষুশূল,
রূপে গন্ধে ফুল-মাঝে যাহারা নগণ্য,
বসন্ত কি কন্দর্পের যারা নয় সৈন্য,
যার দিকে কভু নাহি ঝোঁকে অলিকুল—
আমি খুঁজি সেই ফুল, হইয়া বিহ্বল,
যাহার অন্তরে আছে গন্ধ-হলাহল।
নয়নের পাতে যার আছে ঘুমঘোর,
চির-দিবাস্বপ্নে যারা আছে মশ্‌গুল,
তাদের নেশায় আমি হতে চাই ভোর—
ভালোবাসি তাই অমি ধুতুরার ফুল॥

১৯ নবেম্বর ১৯১২
রাঁচি

অপরাহ্ণ

গোলাপ, গোলাপ, শুধু গোলাপের রাশি!
গোলাপের রঙ ছিল অনন্ত আকাশে,
গোলাপের গন্ধ ছিল ধরাতে বাতাসে,
নারীর অধরে ছিল গোলাপের হাসি॥

রঙ এবে গেছে জ্বলে, গন্ধ হল বাসি।
শুখানো পাতার রাশি ওড়ে চারিপাশে,
বসন্ত-নিদাঘে পুড়ে ছাই হয়ে আসে,
পৃথিবীতে মনে হয় হয়েছি প্রবাসী॥

অলক্ষিতে খসে গেছে মায়া-রত্নঠুলি।
এ বিশ্ব মাটির গড়া, দেখি চক্ষু খুলি॥

আশার গোলাপী নেশা গিয়াছে ছুটিয়া,
যে নেত্রে আদর ছিল, হেরি অবহেলা।
যৌবনের স্বর্ণপুরী গিয়াছে টুটিয়া—
মহাশূন্য-মাঝে আজি করি ধুলাখেলা॥

১৬ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

ব্যর্থ বৈরাগ্য

এসেছে নূতন দিন, ধরি যোগীবেশ।
কালকের ফুল যত গিয়েছে শুকিয়ে,
কালকের ভুল যত গিয়েছে চুকিয়ে,
আগেকার জীবনের পালা হল শেষ॥

ঝরা ফুলে ভরা বিশ্ব, গন্ধ নাহি লেশ।
জীবনের বেশি ভাগ দিয়েছি ফুঁকিয়ে,
বাকিটুকু মৃত্যুপানে পড়েছে ঝুঁকিয়ে,
যে সুর বাজিত কানে, নাহি তার রেশ॥

জীবনের স্রোত চলে দক্ষিণবাহিনী।
উত্তরে পড়িয়া থাকে পূর্বের কাহিনী॥

উপরে উঠিছে ভাসি নব ভয় আশা,
বিরাম মানে না স্রোত, বহে খরধার।
আবার ফেলিতে হবে জীবনের পাশা—
খেলা নিয়ে কথা শুধু, মিছে জিত হার!

২৫ অগস্ট ১৯১২

অন্বেষণ

আজিও জানি নে আমি হেথায় কী চাই !
কখনো রূপেতে খুঁজি নয়ন-উৎসব,
পিপাসা মিটাতে চাই ফুলের আসব,
কভু বসি যোগাসনে, অঙ্গে মেখে ছাই ॥

কখনো বিজ্ঞানে করি প্রকৃতি যাচাই,
খুঁজি তারে যার গর্ভে জগৎ প্রসব,
পূজা করি নির্বিচারে শিব কি কেশব—
আজিও জানি নে আমি তাহে কিবা পাই

রূপের মাঝারে চাহি অরূপদর্শন।
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গস্পর্শন ॥

খোঁজা জানি নষ্ট করা সময় বৃথায়—
দূর তবে কাছে আসে, কাছে যবে দূর।
বিশ্রাম পায় না মন পরের কথায়,
অবিশ্রান্ত খুঁজি তাই অনাহত সুর ॥

১৭ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

আত্মপ্রকাশ

প্রকৃতিরই অংশে গড়া আমাদের মন।
বিশ্বছবি দেখি স্পষ্ট রহিয়াছে আঁকা,
বিশ্বের হৃদয় কিন্তু বিশ্বদেহে ঢাকা,
আভাসে প্রকাশ তার, আসল গোপন ॥

সবারই অন্তরে আছে গুপ্ত নিকেতন,
মনোপাখি সুপ্ত যাহে, গুটাইয়া পাখা।
সে নিদ্রা যোগীরা জানে পূর্ণ জেগে থাকা-
খুলে বলা বৃথা চেষ্টা তাহার স্বপন ॥

অন্তরের রহস্যের সঠিক বারতা
কথায় প্রকাশ পায়, এটি মিছে কথা ॥

ভাষায় যা-কিছু ধরি, উপরেই ভাসে,
স্বেচ্ছায় করেছে যাহা আলোক বরণ ;
সত্য কিন্তু তারি নীচে মুখ ঢেকে হাসে—
কভু নাহি দেখা দেয় বিনা আবরণ ॥

১৩ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

বিশ্বরূপ

কে জানে কাহার বিশ্ব— দৃশ্য চমৎকার !
আলোকে আঁধারে এই খোলা আর মেলা,
জড়েতে চৈতন্যে এই লুকোচুরি খেলা,
তারি মাঝে মূল তানে ওঠে ঝনৎকার ॥

দেখে শুনে হতবুদ্ধি আমি সনৎকার !
সুনীল আকাশ-সিন্ধু, কোথা তার বেলা,
সারি সারি ভাসে তারা, জ্যোতিষ্কের ভেলা,
কোথা যায় নাহি জানি, নহি গনৎকার !

বিশ্বটানে মন যায় বিশ্বেতে ছড়িয়ে।
অন্তর থাকিতে চায় বাহিরে জড়িয়ে ॥

আমি চাই টেনে নিয়ে ছড়ানো প্রক্ষিপ্ত,
অন্তরে সঞ্চিত করি আঁধার আলোক,
প্রতীক রচনা করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত—
চতুর্দশ পদে বদ্ধ চতুর্দশ লোক !

২০ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

শিব

রজতগিরিতে হেরি তব শুভ্রকায়া,
চন্দ্র তব ললাটের চারু আভরণ,
তব কণ্ঠে ঘনীভূত সিন্ধুর বরণ—
বিশ্বরূপ জানি আমি তব দৃশ্য মায়া ॥

যার স্ফূর্তি চরাচর, সে তো তব জায়া।
নিজদেহে করিয়াছ বিশ্ব আহরণ—
তাই হেরি কৃত্তি তব চিত্র-আবরণ—
জীবনের আলোশ্লিষ্ট মরণের ছায়া!

তোমার দর্শন পাই মূর্তিমান মন্ত্রে,
যজ্ঞসূত্রে বাঁধা যাহা হৃদয়ের তন্ত্রে ॥

সেই রূপ রেখো দেব ভরিয়া নয়নে—
শিবমূর্তি হেরি বিশ্বে, দেহো এ ক্ষমতা।
ধরিতে পারি না আমি নেত্রে কিম্বা মনে,
আকারবিহীন কোনো বিশ্বের দেবতা ॥

[? অক্টোবর ১৯১২
শিলং]

বিশ্ব—ব্যাকরণ

বিজ্ঞান রচেছে নব বিশ্ব-ব্যাকরণ।
ক্রিয়া কিম্বা কর্ম নাই, শেখায় বেদান্ত—
ক্রিয়া আছে, কর্তা নাই, বিজ্ঞান-সিদ্ধান্ত,
আগাগোড়া কর্ম শুধু, নাহিকো করণ॥

সকলি বিশেষ্য, কিম্বা সবই বিশেষণ,
এই নিয়ে দ্বন্দ্ব নিত্য, লড়াই প্রাণান্ত!
সন্ধি কি সমাস সৃষ্টি, সমস্যা একান্ত—
মীমাংসা করিতে চাই ধাতু-বিশ্লেষণ॥

সর্বনাম রূপ আছে, নাহিকো অব্যয়।
কেবল বচনে হয় সৃষ্টির অন্বয়॥

প্রকৃতির সূত্র আছে, নাই অভিধান,
জড় ক'রে তাই জ্ঞানী রচে মুগ্ধবোধ।
পণ্ডিতের পক্ষে তারই মুখস্থ বিধান—
আমরা নির্বোধ, তাই চাই অর্থবোধ!

২৯ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

বিশ্বকোষ

বিশ্বের সবাই মোরা পাঠকপাঠিকা।
পাতা তার খোলা আছে ঠিক মাঝখানে,
দেখামাত্র বুঝি মোরা স্পষ্ট তার মানে,
বাজে কাজ করা তার আদ্যোপান্ত টীকা॥

ধরণীকে চূর্ণ করি, জ্ঞানের বটিকা
গড়ে কিন্তু তিতো ক'রে দর্শনে বিজ্ঞানে,
সে গুলি মূর্খেতে গেলে, বুজে চোখ কানে-
জানে না তাহার মূল্য নয় বরাটিকা!

বিশ্বসনে দিনরাত শুধু বোঝাপড়া,
সে তো নয় ঘর করা, করা সে ঝগড়া!

নয়নেতে আছে আলো, মনে ভালোবাসা,
অন্ধকার জীবনের অপর পৃষ্ঠেতে।
সুখ দুঃখ দুই কহে প্রণয়ের ভাষা--
সে-ভাষা না বুঝে, খোঁজ' মানে অদৃষ্টেতে।

১১ নবেম্বর ১৯১২
স্টোর রোড। বালিগঞ্জ

সুরা

সুরার সুরত্ব জানি আমি আর তুমি !
সুরা-তৈলে মনোবাতি ছড়ায় আলোক,
মনের মন্দিরে বাজে মন্দিরা ঢোলক—
এ কথা ওমার জানে, হাফিজ্ আর রুমি ॥

রাত্রি বাড়ে, মাত্রা চড়ে, পাত্রাধর চুমি।
আকাশেতে চাঁদ ঝোলে, আলোর গোলক,
নীলাম্বরী-আড়ে দোলে মোতির নোলক,
শূন্যে উড়ে তাই ধরি, শয্যা শেষে ভূমি !

জড়েতে চৈতন্যরূপী তরল আগুন,
তোমার পরশে মাঘ গলিয়া ফাগুন !

হাবুডুবু খাই সবে ভবসিন্ধু-নীরে,
ঢোকে ঢোকে পেটে ঢোকে লবণ তরল।
সুরাসুরে তাই মথি তুলিয়াছে তীরে,
প্রকৃতির খাঁটি রস, অমৃত-গরল !

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১২

রূপক

কখনো অন্তরে মোর গভীর বিরাগ,
হেমন্তের রাত্রি-হেন থাকে গো জড়িয়ে,
—যাহার সর্বাঙ্গে যায় নীরবে ছড়িয়ে
কামিনী ফুলের শুভ্র অতনু পরাগ ॥

বাসনা যখন করে হৃদয় সরাগ,
শিশিরে হারানো বর্ণ, লীলায় কুড়িয়ে,
চিদাকাশে দেয় জ্বেলে, বসন্ত গড়িয়ে
কাঞ্চন ফুলের রক্ত চঞ্চল চিরাগ ॥

কভু টানি, কভু ছাড়ি, মনের নিশ্বাস।
পক্ষে পক্ষে ঘুরে আসে সংশয় বিশ্বাস ॥

বসন্তের দিবা, আর হেমন্ত-যামিনী,
উভয়ের দ্বন্দ্বে মেলে জীবনের ছন্দ।
দিবাগাত্রে রঙ আছে, নিশাবক্ষে গন্ধ—
সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত সার কাঞ্চন কামিনী ॥

১৩ ডিসেম্বর ১৯১২

একদিন

একদিন একা বসি, শিরে রাখি কর,
একমনে করি যবে কবিতা বয়ন,
শব্দের কুসুম করি স্মৃতিতে চয়ন—
সহসা ফুলের গন্ধে ভরে গেল ঘর।
তখন ছিল না কিছু ইন্দ্রিয়গোচর,
সুপ্ত ভাব, ত্যজি মোর হৃদয়-শয়ন,
উঠেছিল সেই ক্ষণে মেলিয়া নয়ন—
ফুলের নিশ্বাস প'ল চুলের উপর ॥

লিখিয়াছি সবে যবে দুই-চার ছত্র,
নীলাব্জ-আভায় হল সুরঞ্জিত পত্র।
শেষে যেই মিলে গেল অন্তিম চরণ,
অধরে মিলিল এসে ফুলের অধর,
চোখেতে ফুলের হেরি রক্তিমবরন,
কানে শুনি প্রিয়া-কণ্ঠ-গলিত আদর!

১৮ নবেম্বর ১৯১২
রাঁচি

ভুল

ভালো তোমা বেসেছিনু, মিছে কথা নয়
যেদিন একেলা তুমি ছিলে মোর সাথী,
বকুলের তলে বসি, মনে মন গাঁথি।
—বকুলের গন্ধ বলো কতদিন রয়?

সেদিন পৃথিবী ছিল অন্ধকারময়,
ঘন মেঘে ঢেকেছিল নক্ষত্রের বাতি,
সে তিমির চিরেছিল বিদ্যুৎ-করাতি।
—বিদ্যুতের আলো কিন্তু কতক্ষণ রয়?

স্বপ্ন মোরা ভুলে যাই নিদ্রা গেলে টুটে,
সাদা চোখে সব দেখি নেশা গেলে ছুটে॥

নিভানো আগুন জানি জ্বলিবে না আর,
মনে কিন্তু থেকে যায় স্মৃতিরেখা তার—
হৃদিলগ্ন আমরণ পারিজাত-হার।
হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার!

২০ নবেম্বর ১৯১২
রাঁচি

হাসি

যতই দিই না আমি হাসিতে উড়িয়ে,
সমাজের সংসারের অন্ধ ক্রূর বল—
সে তো শুধু খেলামাত্র, শুধু বাক্‌ছল,
এখনো যায় নি প্রাণ একান্ত জুড়িয়ে॥

নয়ন যখন দিই হাসিতে মুড়িয়ে,
লুকিয়ে তাহার নীচে থাকে অশ্রুজল।
বৃথা কাজ! জীবনের প্রতি ব্যর্থ পল
স্মৃতিতে একত্র করা, অতীতে কুড়িয়ে॥

জেনে শুনে ছুটি মোরা আলেয়ার পিছে,
সে আলো নিভিলে তাই কান্নাকাটি মিছে॥

জীবনের দিবসের স্বল্প পরিসর,
ঘিরে তারে আছে ঘন অনন্তের ছায়া।
যদিচ ধরেছি সবে দুদিনের কায়া—
হাসির, কাজের, তবু আছে অবসর॥

১৫ জানুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

রোগশয্যা

যখনি চেয়েছি আমি, পরি বীরসজ্জা,
কাম্যরাজ্য-বিজয়ের ধরি দৃপ্ত আশা,
দ্রুতবেগে যাই লঙ্ঘি শতদ্রু বিপাশা—
তখনি পেয়েছি আমি শুধু রোগশয্যা ॥

ব্যথায় ভরিয়া ওঠে মম অস্থি মজ্জা ;
সর্বাঙ্গের মুখে ফোটে ব্যর্থ আর্তভাষা,
সংকল্পের ধ্বংস করে দেহ কর্মনাশা,
রোগেতে লাঞ্ছিত হয়ে মন মানে লজ্জা ॥

দেহের আশ্রয়ে থাকি দিন দুই-চার—
তাই সই তার নীচ অন্ধ অত্যাচার ॥

দেহের পীড়নে মনে আসে না বিকার,
শয্যাপ্রান্তে পাত্রপূর্ণ আছে ভালোবাসা,
যাহাতে মিটাই তীব্র রোগীর পিপাসা,
সে সুধার লাগি করি রোগের স্বীকার ॥

১৬ নবেম্বর ১৯১২
রাঁচি

মুশকিল-আসান

ছেলেবেলা একদিন প্রতিমা-ভাসান
একেলা দেখিতে যাই, ঘর ছেড়ে দূরে।
পথ ভুলে রাত্রিবেলা মরি ঘুরে ঘুরে,
ভয়েতে বিহ্বল দেখি সুমুখে শ্মশান!

অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে হই পরিশান,
কাঁপে বুক, ঝরে আঁখি, বাক্য নাহি স্ফুরে।
সহসা মশাল হাতে, ভিখারির সুরে,
পথিক আসিল হাঁকি 'মুশকিল-আসান'!
তস্‌বির মালা হাতে, গায়ে আলখাল্লা,
মুখেতে মুখস্থ বুলি 'লা-আল্লা-ইলাল্লা'!

আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ,
কানেতে না পশে মোর দুনিয়ার হাল্লা।
হৃদয়-ফকির জপে 'লা-আল্লা-ইলাল্লা',
আকাশেতে শুনি বাণী 'মুশকিল-আসান'!

১৫ নবেম্বর ১৯১২
রাঁচি

বাহার

নটীবেশে তুমি এস, রাগিণী বাহার !
অঙ্গরাগ ধরি নব উজ্জ্বল শ্যামল,
মালতীর মালা চুলে, করেতে কমল,
চরণে তাড়না করি শীতের নীহার ॥

বিলাসী পবন-সনে উদ্যানবিহার
কর তুমি, অঙ্গে মাখি মল্লি-পরিমল।
নেত্রপুটে ধরি আভা কৌমুদী-কোমল,
ধরায় সলীল স্বর দাও উপহার ॥

তোমার পাপিয়া-কণ্ঠ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে,
বসন্তের তানে দাও দিগন্ত ছাপিয়ে ॥

স্বরে গেঁথে সাত-ন'র বৈজয়ন্তী-হার
ঝুলিয়ে দুলিয়ে দাও আকাশের গলে !
শোক দুঃখ ভয় বাধা করি পরিহার,
উঠুক প্রাণের দীপ মুহূর্তেক জ্বলে ॥

১৮ জানুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

পূরবী

সন্ধ্যার ছায়ায় লীন, মলিন পূরবী !
বিষাদ তোমার চোখে, অবসাদ প্রাণে।
মগ্ন তুমি হয়ে আছ সূর্যাস্তের ধ্যানে,
ধূম্র তব কেশপাশে ধূপের সুরভি।
উদাসিনী তুমি, নও করুণ ভৈরবী,
উন্মনা তোমার গানে, মনে সন্ধ্যা আনে।
আঁখি খোঁজে শেষ আলো অস্তাচলপানে,
লেখে যথা চিত্রস্বর্ণে, হরফে আরবী
সূর্য তার রূপকথা ; পড়িতে না জানি,
নিশায় মিলিত দিবা স্বপ্ন হেন মানি।
শ্রান্তিভরা শান্তি আছে তব শ্লথ সুরে,
উদাসিনি ! তব মন্ত্রে হয়েছি উদাস।
তোমার প্রণয়ী ছিল কবি নিশাপুরে,
হে পূরবী ! করো মোরে তব সুরদাস॥

২৪ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

শিখা ও ফুল

সতৃষ্ণ রসনা মেলি মনের পাবক,
মনোজবা রূপ ধরি ওঠে যবে হাসি,
—গলিত লোহিত ক্ষুব্ধ প্রবালের রাশি—
সে শিখা পরায় তব চরণে যাবক ॥

তুষারে গঠিত ফুল, স্তবকে স্তবক,
মনোমাঝে জাগে যবে শুভ্র হাসি হাসি',
সে ফুলে অঞ্জলি ভ'রে দিই রাশি রাশি
জাতী শেফালিকা কুন্দ কুরুবক ॥

তুমি চাহ রূপস্পর্শ উল্‌টো বিলকুল—
ফুলের আগুন, কিম্বা আগুনের ফুল ॥

আমি কিন্তু ক'রে যাব কুসুমের চাষ,
যতদিন এ হৃদয় না হয় ঊষর।
জ্বেলে রাখি বহ্নি জবাকুসুমসংকাশ—
যে বহ্নি নিভিলে হয় জগৎ ধূসর!

জানুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

গজল

নয়ন-গোলাপ তব করিতে উজ্জ্বল,
বুল্‌বুলের সুরে আজি বেঁধেছি সেতার।
গাহিব প্রেমের গান পারসী কেতার,
ফুলের মতন লঘু রঙিলা গজল!

যে সুর পশিয়া কানে চোখে আনে জল,
সে সুর বিবাদী জেনো মোর কবিতার।
মম গীতে নত তব চোখের পাতার
সীমান্তে রচিয়া দিব ছু ছত্র কাজল!

বাজিয়ে দেখেছি ঢের বীণ ও রবাব,
পাই নি সে সুরে তব প্রাণের জবাব॥

আজ তাই ছাড়ি যত ধ্রুপদ ধামার
চুট্‌কিতে রাখি সব আশা ভালোবাসা।
দরদ ঈষৎ আছে এ গীতে আমার—
সুরে ভাবে মিল আছে, ছুই ভাসা-ভাসা!

৪ জানুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

পাষাণী

কত-না করেছি আমি তোমায় আদর,
চঞ্চল হয় নি তব নয়ন-কুরঙ্গ।
সুবর্ণ-কঠিন তব হৃদয়-নারঙ্গ,
খোল নি সরিয়ে কভু বুকের চাদর॥

যৌবনে আসে নি তব শ্রাবণ ভাদর,
ছাপিয়ে ওঠে নি বুকে বাসনা-তরঙ্গ।
মেঘ-রাগে বাঁধ' নাই হৃদয়-সারঙ্গ,
তব মন নাহি জানে বিদ্যুৎ বাদর॥

তব প্রাণে ভালোবাসা রয়েছে ঘুমিয়ে,
জাগাতে পারি নি আমি হাজার চুমিয়ে!

বিরহে মিলনে কিম্বা হও না কাতর,
তোমার অন্তরে নাই রক্ততপ্ত রতি,
দেবীর প্রতিমা তুমি, কেবল পাথর—
মনোদীপে এবে করি তোমার আরতি॥

১৭ নবেম্বর ১৯১২
রাঁচি

প্রিয়া

কারো প্রিয়া সুললিত সারিগান গেয়ে,
—রক্তিম-কপোল উষা জাগে যবে হেসে—
রুপোর ঢেউয়ের 'পরে তালে তালে ভেসে,
দক্ষিণপবন-সনে আসে তরী বেয়ে॥

কারো প্রিয়া মেঘসম চতুর্দিক ছেয়ে,
অকালের প্রলয়ের অমানিশা বেশে,
দুরন্ত পবনে ক্ষিপ্ত ঘনকৃষ্ণ কেশে,
প্রচণ্ড ঝড়ের মতো আসে বেগে ধেয়ে॥

তুমি প্রিয়ে এ হৃদয়ে পশি ধীরে ধীরে,
বহিছ প্রাণের মতো প্রতি শিরে শিরে।
প্রচ্ছন্ন রূপেতে আছ আচ্ছন্ন করিয়া
আমার সকল অঙ্গ, সকল অন্তর।
সকল ইন্দ্রিয় মোর জ্যোতিতে ভরিয়া,
জোগাও প্রাণের মূলে রস নিরন্তর॥

৫ জানুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

পরিচয়

দেখেছি তোমায় কোনো মাধবী পার্বণে,
প্রকৃতির ঐশ্বর্যের সৌন্দর্যের সার !
এসেছিলে ধ'রে রূপ প্রতিমা উষার,
গন্ধর্বশালায় কিম্বা আলেখ্য-ভবনে ॥

মেঘাচ্ছন্ন কোনো দূর অতীত শ্রাবণে,
এসেছিলে কাছে কিম্বা, করি অভিসার,
আঁধারের মাঝে করি রূপের প্রসার,
গগন-সীমান্তে কোনো বিস্মৃত ভুবনে !

তোমা-সনে ছিল জানি পূর্ব-পরিচয়—
মন কিন্তু যুগস্মৃতি করে না সঞ্চয় ॥

ভাসিয়া চলেছি দোঁহে হাতে হাত ধরে
ছাড়াছাড়ি হবে কি গো, পাব যবে কূল ?
অথবা মিলন হলে জীবনের পরে,
চিনিতে আবার হবে পরস্পরে ভুল ?

১৭ জানুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

ফুলের ঘুম

বরফ ঢাকিয়া ছিল ধরণীর বুক
অখণ্ড শীতল শুভ্র চাদর পরিয়ে।
রাশি রাশি চন্দ্রালোক নিঃশব্দে ঝরিয়ে,
আপাণ্ডুর ক'রে ছিল নীলিমার মুখ॥

সেদিন ছিল না ফুটে শিরীষ কিংশুক,
গিয়েছিল বর্ণ গন্ধ সকলি মরিয়ে।
তুষারের জটাভার শিরেতে ধরিয়ে
বৃক্ষলতা সমাধিস্থ ছিল হয়ে মূক॥

পাতার মর্মর আর জল-কলরব,
হিমের শাসনে ছিল নিস্তব্ধ নীরব॥

পৃথিবীর বুক হতে তুষার সরিয়ে
সেদিন দেখি নি আমি, কোথায় গোপনে,
সুষুপ্ত ফুলেরা সবে নয়ন ভরিয়ে
রেখেছিল বসন্তের রক্তিম স্বপনে!

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

স্মৃতি

কত দিন কত দেশে কত শত ভোরে,
অসংখ্য ফুলেতে ভরা কত ফুলবনে,
ফিরেছি অলসভাবে, একা, আনমনে—
তুলি নি পূজার লাগি কিন্তু সাজি ভরে॥

কত দিন কত দেশে সারানিশি ধরে,
থেকেছি বসিয়া আমি মন্দিরের কোণে,
স্নিগ্ধদৃষ্টি কত শত দেবতার সনে—
করি নি প্রণাম কিন্তু জুড়ি দুই করে॥

আগে শুধু করে গেছি এই সব ভুল।
এখন দেবতা কোথা, কোথা সেই ফুল!

আজি সে ফুলের গন্ধ রয়েছে সঞ্চিত
অস্পষ্ট স্মৃতির মতো, সব মন ছেয়ে।
দেবতার স্থিরনেত্র, পূর্বপরিচিত,
রত্নদীপশিখা-সম, দূরে আছে চেয়ে!

৩১ জানুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

প্রতিমা

প্রতিমা গড়েছি আমি প্রাণপণ ক'রে।
আঁধারে আবৃত কত খুঁজে গুপ্ত খনি,
এনেছি তারার মতো জ্যোতির্ময় মণি—
রত্ন দিয়ে দেবীমূর্তি গড়িবার তরে।
স্ফটিকে গড়েছি অঙ্গ নিশিদিন ধরে,
পরায়েছি শ্যামশাটী মরকতে বুনি,
রক্তবিন্দু-পারা দুটি সুলোহিত চুনি
বিন্যস্ত করেছি আমি দেবীর অধরে॥

প্রজ্বলিত ইন্দ্রনীলে খচিত নয়ন,
প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ,
মুকুতা-নির্মিত যুগ্ম ঘন-পীন-স্তন,
সুকঠিন পদ্মরাগে গঠিত চরণ।
অপূর্ব সুন্দর মূর্তি, কিন্তু অচেতন—
না পারি পূজিতে কিম্বা দিতে বিসর্জন!

[? ফেব্রুয়ারি ১৯১৩]

উপদেশ

প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালোবাসা,
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
তার লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন—
জোর-করা ভাব, আর ধার-করা ভাষা!

বড়ো কবি কিম্বা হতে যদি তব আশা,
ভাবুক বলিবে তোমা জনসাধারণ,
শেখ' যদি সমাজের, করি প্রাণপণ—
দরকারী ভাব, আর সরকারী ভাষা!

যত যাবে মাটি আর খাঁটিকে ছাড়িয়ে,
শূন্যে শূন্যে মূল্য তব যাইবে বাড়িয়ে॥

কবিতার জন্মস্থান কল্পনার দেশ,
সে দেশ জানে না কিন্তু মোদের ভূগোল–
সত্যের সেখানে নেই কোনো গণ্ডগোল,
দেহ নেই সেই দেশে, শুধু আছে বেশ!

১৫ নবেম্বর ১৯১২
রাঁচি

স্বপ্ন-লঙ্কা

স্বপ্নলোকে আছে মোর স্বর্ণপুরী লঙ্কা,
যেথা বাজে মির্‌গেল, ডান ও ঘাগর।
শিখি নাই একলম্ফে লঙ্ঘিতে সাগর—
সেতুর বন্ধন করি, নাই হেন টঙ্কা!

সে রাজ্যে সজোরে বাজে অনঙ্গের ডঙ্কা,
কঙ্কাবতী যেথা মেলি নয়ন ডাগর,
মোর পথ চেয়ে করে বাসর জাগর—
স্বপ্নে আমি যাই সেথা, নাহি করি শঙ্কা॥

লীন হয়ে প্রিয়া-অঙ্কে, সুবর্ণ পালঙ্কে,
কলঙ্কের মতো রই জড়ায়ে শশাঙ্কে!

মিলনের অহংকারে সালংকারা কঙ্কা,
নূপুরে কঙ্কণে তোলে বীণার ঝংকার,
রসনায় দেয় মুহু বিজয়-টংকার—
সে শব্দে চমকি জাগি, হেরি নবডঙ্কা!

২৫ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

আত্মকথা

কবিতা আমার জানি, যেমন শঙ্কুর,
দু দিনে সবাই যাবে বেবাক ভুলিয়ে!
কল্পনা রাখি নে আমি আকাশে তুলিয়ে—
নহি কবি ধূম্‌পায়ী, নলে ত্রিবঙ্কুর ॥

হৃদয়ে জন্মিলে মোর ভাবের অঙ্কুর,
ওঠে না তাহার ফুল শূন্যেতে দুলিয়ে।
প্রিয়া মোর নারী শুধু, থাকে না ঝুলিয়ে
স্বর্গ-মর্ত্য-মাঝখানে, মতো ত্রিশঙ্কুর!

নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন—
আমার হৃদয় যাচে বাহুর বন্ধন ॥

কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল,
মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল—
মনোঘুড়ি বুঁদ হলে ছাড়ি নে লাটাই!

১৭ ডিসেম্বর ১৯১২

পাদচারণ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

করকমলেষু

গদ্যের কলমে-লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, আমার বিশ্বাস, এগুলির ভিতর আর-কিছু না থাক্, আছে rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ reason।

এর প্রথমটি যে পদ্যের এবং দ্বিতীয়টি গদ্যের বিশেষ গুণ, এ সত্য আপনার কাছে অবিদিত নেই; সুতরাং আশা করি আমার এ রচনা আপনার কাছে অনাদৃত হবে না।

ওঁ

তোমার নামেতে সবে মিছে কথা বলে,
সকলে জানিত যদি তোমার স্বরূপ,
কিছুই থাকিত নাকো এখন যেরূপ—
তোমার নামেতে শুধু মিছে কথা চলে।

তোমারে খুঁজিয়া কেহ কোথাও না পায়,
বাহিরেতে নাহি মেলে তোমার দর্শন,
ভিতরেতে নাহি মেলে তোমার স্পর্শন,
শোনার অধিক জানা কেহই না চায়।

তোমার কাহিনী যত, সব রূপকথা,
তোমার ব্যাখ্যান করা জ্ঞানের মূর্খতা।

কেহই বলিতে নারে তুমি কিবা হও,
আলোকে থাক' না তুমি, না থাক' আঁধারে।
কেহই বলিতে নারে তুমি কিবা নও—
সবেতে জড়িয়ে আছ ছায়ার আকারে॥

১৯১১

বিলাতে রবীন্দ্র

বিলাতের গেছে সে একদিন
সুরে বাঁধা ছিল কবির বীণ,
দিগন্ত-প্রসারী ঝংকার যার
আজিও কাঁপায় মনের তার।
সে সুর ভেঙেছে নূতন তন্ত্র,
এখন ক্যাঁকায় মানুষ-যন্ত্র,
দ্যুলোক পড়েছে ধোঁয়ায় চাপা,
প্রকৃতির বাণী কালিতে ছাপা।

সহসা তুলেছে জাগায়ে প্রাণ,
পুব হতে এসে রবির গান,
ভারতী যাহার কলম ধ'রে
নিতি নব গান রচনা করে,
লিখে রাখে নভে, জলে ও স্থলে,
রূপের বারতা সোনার জলে।

২২ সেপ্টেম্বর ১৯১২

কবিতা লেখা

এ যুগে কঠিন কবিতা লেখা,
কবিরা পায় না নিজের দেখা।
ঢাকা চাপা দিয়ে মনটি রাখি,
নিজ ধনে পড়ে নিজেই ফাঁকি।
গলা চেপে গায় প্রেমের গান,
ভয়ে ভয়ে ছাড়ে প্রাণের তান।
ভাব-মদে হলে নয়ন লাল,
দশে মিলে দেয় তুচোখো গাল।

সুরুচি সুনীতি যুগল চেড়ী
কল্পনা-চরণে পরায় বেড়ি।
কবিতা কয়েদী, রাধার মতো
দায়ে পড়ে করে গৃহিণী-ব্রত।
বাঁশি বাজে বনে বসন্ত রাগে,
জটিলা কুটিলা তুয়ারে জাগে।

২২ সেপ্টেম্বর ১৯১২

বন্ধুর প্রতি

লোকে বলে আছে তব কিঞ্চিৎ ক্ষ্যাপামি,
তথাপি আমার তুমি চির প্রিয়পাত্র।
তোমাতে আমাতে আছে মিল এই মাত্র—
ঠকিতে যদিও শিখি, শিখি নে ঠকামি।
জীবনে জ্যাঠামি আর সাহিত্যে ন্যাকামি
দেখে শুধু আমাদের জ্বলে যায় গাত্র,
কারো গুরু নই মোরা, প্রকৃতির ছাত্র,
আজো তাই কাঁচা আছি, শিখি নি পাকামি

নীতি আর রাজনীতি আর ধর্মনীতি,
যত প্রভু গুরু সেজে শিক্ষা দেয় নিতি।
প্রিয় শিষ্য কারো নই তুমি আর আমি,
আমাদের রোগ খোঁজা গুরুবাক্যে মানে—
অথচ এদেশে সবে ঠিক মনে জানে,
যা-কিছু বোকামি নয় তাহাই ক্ষ্যাপামি।

২৭ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

ফস্‌লে গুল্‌মে ময়্‌সে তৌবা ?

বসন্ত এনেছে সঙ্গে পাঁচরঙা ফুল,
মখমলে কিংখাবে কেউ জবরজঙ,
ঠোঁটে গালে রঙ মেখে কেউ সাজে সঙ—
বসন্তে বাসন্তী সুরা রঙেতে অতুল।

বসন্ত এনেছে সঙ্গে নানাগন্ধ ফুল,
কেউ তীব্র, কেউ মৃদু, কারো মিশ্র ঢঙ,
কেউ গুরু-গন্ধগর্বে একেবারে টঙ—
মধুগন্ধে শীধু তুমি একেলা অতুল।

এসো সখি স্ফটিকের সুরাপাত্র ভরি,
রূপরসগন্ধ-সার শুষে পান করি।
ওকি কথা ? কার ভয়ে হও তুমি ভীতু ?
সুরাপানে পাপ হবে ?— হোক-না তাই বা !
জীবনে কদিন আসে কুসুমের ঋতু ?
ফস্‌লে গুল্‌মে ছি ছি ময়্‌সে তৌবা ?

২৭ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

পূর্ণিমার খেয়াল

আজি সখি জ্বেলো নাকো বিজুলির বাতি।
খুলে দাও সব দ্বার, ঘর আজ হোক বার,
বিলায় আলোক-মেলা পূর্ণিমার রাতি।

ঝুলিছে আকাশে দেখো চাঁদের লণ্ঠন,
চারি পাশে তারে ঘিরি তারার দেয়ালগিরি,
গগনের গায়ে করে কিরণ বণ্টন।

ফোটে যেন লক্ষ ফুল স্বর্গ-বাগিচায়।
অথবা জরির বুটা সব সাচ্চা, নয় ঝুঁটা,
চন্দ্রের সভায় পাতা নীল গালিচায়।

নানা রূপ ধরে আজি বহুরূপী ইন্দু,
কখনো মন্দির-শিরে নেমে এসে ধীরে ধীরে,
বসে যেন আকারের শিরে চন্দ্রবিন্দু।

যামিনীর গণ্ড চুমি মহা অহংকার!
আলো ফেলে তাব চুলে কভু থাকে যেন ঝুলে
কামিনীর কর্ণভূষা স্বর্ণ-অলংকার।

সোনার কমল কভু, লুপ্ত যার বোঁটা;
দাস আকাশ-ভালে রচে কভু স্ব-খেয়ালে,
চন্দনের পঙ্কে লিপ্ত কেশরের ফোঁটা।

চন্দ্রের রমণী যত কৃত্তিকা ভরণী,
শীধুপানে হেসে হেসে বিধু পানে আসে ভেসে,
জ্যোৎস্না সাগরে বেয়ে সোনার তরণী।

শশী পশি সুরাপাত্রে হয়ে প্রতিবিম্ব,
লাল হয়ে মদ-রাগে অধীর চুম্বন মাগে
সুরাসিক্ত তব সখি অধরের বিম্ব।

আজিকার এ পর্বের নায়ক শশাঙ্ক,
অভিনয় সারারাত ক'রে যাবে প্রতিপাত,
আনন্দের নাটকের সম্পূর্ণ দশাঙ্ক।

আমি আছি, তুমি আছ, আর আছে চন্দ্র।
পাত্রে ঢালো পোখ্‌রাজ কোলে তুলে এস্‌রাজ
সুরা আর সুরে মিশ্র গাও গীত মন্দ্র।

এ রাতে কে কার মানে শাসন বারণ?
তুমি আমি নিশিভোর থাকিব নেশায় ভোর—
বারোমাস উপবাস, আজিকে পারণ!

২১ ডিসেম্বর ১৯১২

The Book of Tea

শ্রীযুক্ত কাকুৎস ওকাকুরা করকমলেষু

জাপানে চা-পান ব্রত শিক্ষা দিল চীন,
মনেতে লেগেছে ছোপ তারি পীত রঙ।
চায়ের রঙিন নেশা স্বপ্নে ছায় দিন—
ভারতের খেয়ালের কিন্তু জুদা ঢঙ।

গৈরিক আমরা জানি এক পাকা বর্ণ,
—ধুলার ধূসরে লিপ্ত হৃদয়ের রক্ত।
চা-পত্র হৃদয়মুক্ত তপ্ত দ্রব স্বর্ণ,
আত্মার সবর্ণ তাহে দেখে পীত ভক্ত।

হরিৎ পাতায় লেখে পীত শেষ বাণী,
পড়ি' তাই আমাদের সুবর্ণে বিরাগ।
শরতে বসন্ত পূর্ণ জানিয়া জাপানী,
সৌন্দর্যের সীমা মানে মৃত্যুপূর্ব রাগ।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১২

সনেট-সুন্দরী

বিগাঢ়যৌবনা তন্বী, আকারে বালিকা,
পরিণত দেহখানি আঁটসাঁট ক্ষুদ্র।
শিশির-ঋতুর স্নিগ্ধ মসৃণ রউদ্র
ঘনীভূত ক'রে গড়া স্বর্ণ-পাঞ্চালিকা।

দৃঢ়বন্ধে সুসংযত করে কঞ্চুলিকা
পরিপূর্ণ হৃদয়ের অশান্ত সমুদ্র,
কলার শাসনে দান্ত মন তার রুদ্র,
মন্ত্রদেহ ষোড়শীর ধরেছে কালিকা।

সন্তর্পণে করি তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ,
ভয় হয় অনিপুণ অঙ্গুলি-পরশে
ছিন্নভিন্ন হয়ে তার কাঁচুলির ডোর,
ব্যক্ত হয়ে পড়ে বুকে সংরুদ্ধ আক্ষেপ!
নির্গ্রন্থ হৃদয়মুক্ত উদ্‌বেলিত রসে,
সে রূপ মলিন করে নয়নের লোর।

৩১ জুলাই ১৯১৩
বালিগঞ্জ

অকাল বর্ষা

ভীম ভাব

বরষা এসেছে আজ সেজে বাজিকর,
মেঘের ধরিয়ে শিরে ঘন জটাজাল।
অদ্ভুত মায়াবী ঋতু, রচি ইন্দ্রজাল,
চোখের আড়ালে রাখে গ্রীষ্মের ভাস্কর।

সঘনে বাজায়, হয়ে বদ্ধপরিকর,
অম্বরে ডমরু, লক্ষ অলক্ষ্য বেতাল,
বিদ্যুৎ-নাগিনী যত, ত্যজিয়ে পাতাল,
অন্তরীক্ষে নাচে সবে, করে ধরি কর।

থেকে থেকে হেসে ওঠে বিচিত্র বিশাল
গগনের কোণে কোণে রঙের মশাল।

বরষা-পরশে দিবা রাত্রিরূপ ধরে,
আগুনে জলেতে ভুলি জাতিবৈর আজ
খেলা করে আকাশের অন্ধকার ঘরে—
এ বাজির সব ভালো, বাদ দিয়ে বাজ!

১৫ এপ্রিল ১৯১৩

বর্ষা

কান্ত ভাব

বরষা নিশ্বাস ফেলে করেছে মেদুর,
নিদাঘের আকাশের রজত-দর্পণ।
ললিত গতিতে মেঘ করি প্রসর্পণ
হেলায় আচ্ছন্ন করে বৈশাখী রোদ্দুর।

বরষা মেঘের পাখা প্রসারি সুদূর,
মধ্যাহ্নে কপিশ ছায়া করেছে অর্পণ।
তিরস্কৃত দিবাকর হয়ে সন্তর্পণ,
আকাশের অবকাশে ছড়ায় সিঁদুর।

তাপ-খিন্ন কুসুমেরা এবে মাথা তুলি
নয়ন মেলিয়া দেখে অকাল-গোধূলি।

শুভ্র পীত রক্তবর্ণ পরি চারু সাজ,
ক্লান্ত তনু রেখে কান্ত আকাশের কোলে,
ভর দিয়ে ক্ষীণবৃন্তে, মন্দ মন্দ দোলে
চাঁপা আর কৃষ্ণচূড়া আর গন্ধরাজ।

২০ এপ্রিল ১৯১৩
বালিগঞ্জ

সনেট-চতুষ্টয়

কবিতা

কবিতা লিখেছি শখে, হয়েছে কসুর।
প্রথম মুশকিল মেলা চরণে চরণ,
দ্বিতীয় মুশকিল শেখা একেলে ধরন,
তৃতীয় মুশকিল দেখি পাঠক শ্বশুর!

কাব্যলোক জয় করে সুর কি অসুর—
ভারতী যাহার যাচে চরণ শরণ।
কবিতা না করে যদি স্বয়ং বরণ,
টানাটানি তারে করা চরিত্র পশুর।

মিলিয়ে খিলিয়ে কথা আমি লিখি পদ্য,
লোকে বলে, 'ও তো শুধু মিলনান্ত গদ্য।'

পদ্যে শুনি লেখা চাই মনো-ইতিহাস—
মন কিন্তু দেখা দিয়ে লুকায় আবার।
ধরাছোঁয়া দেয় নাকো, করে পরিহাস,
ভাষায় পড়িলে ধরা, অমনি কাবার!

১ অক্টোবর ১৯১২

কাব্যকলা

কবিতার আছে কিছু রকমসকম।
গদ্যে লেখা এক কথা, পদ্যে স্বতন্তর—
বাজে যাতে কাজে লাগে, আর অবান্তর,
ভাব ভাষা দুই চলে ধরিয়া পেখম।

ভাব ছোটে, যদি হয় হৃদয় জখম,
মনোরাগে ফাগ্ খেলে কবির অন্তর,
অম্নি দেয় শুরু করে মনের যন্তর
পায়রার মতো বকা বকম্ বকম্।

অথবা হৃদয় যদি অনলেতে পোড়ে,
ভাব ভাষা দুই গ'লে নিজে হতে জোড়ে!

পোড়া কিম্বা তোড়া নয় যাহার হৃদয়,
বুক আর মুখ যার আছে মেরামত,
কবিতা তাহারে নয় সহজে সদয়—
শব্দ ধরে জব্দ করা তারি কেরামত!

৯ অক্টোবর ১৯১২
S. S. Garhwali
Brahmaputra

আমার সনেট

আমার সনেট নাকি নিরেট সুন্দরী ?
বর্ণের প্রলেপে দেহ কঠিন চিক্কণ,
চরণের আভরণে নাহিকো নিক্বণ,
বুকে নাই রাজযক্ষ্মা, উদরে উদরী ।

শিখর-দশনা তন্বী, শ্যামা ক্ষামোদরী,
মসীকৃষ্ণ স্থির তার নির্ভীক ঈক্ষণ ।
মুগ্ধ নেত্রে মূঢ়ে শুধু করে নিরীক্ষণ—
এ রূপ পশে না হৃদে নয়ন বিদরি ।

ভাষার সুসার আছে, নাই ভাব প্রাণ,
গোলাপের ছোপ আছে, নাই তার ঘ্রাণ

আমি নাকি ভাব-দেহ করি বিশ্লেষণ,
প্রাণহীন মূর্তি গড়ি অঙ্গে অঙ্গ জুড়ে ।
প্রতিমা-দর্শনে শুধু, বিনা আশ্লেষণ,
পোরে না এদের সাধ, গাত্র যায় পুড়ে !

৫ অক্টোবর [১৯১৩]
বালিগঞ্জ

আমার সমালোচক

পরের লেখার এরা করে আলোচনা,
তার পূর্বে জুড়ে দিয়ে সম্ উপসর্গ,
এরে দেয় জাহান্নমে, ওর হাতে স্বর্গ।
আমার বিচারপতি তুমি সুলোচনা।

কবিতার মূলে মম তব প্ররোচনা,
এ লেখা তোমারে তাই করি উৎসর্গ।
ভালো যদি নাহি লাগে, লেখায় বিসর্গ
তোমার আদেশে দিব, গৌরী গোরোচনা!

সনেটের গোনাগাঁথা ছত্র চতুর্দশ—
এ পাত্রে যায় না ঢালা একগঙ্গা রস॥

জানি মোর ভারতীর তনুর তনিমা,
না বধি রাবণ পদ্যে, কিম্বা রাজা কংস!
সাধনার ধন মোর ভাবের অণিমা—
অর্থাৎ ভাষায় ধৃত মনের ভগ্নাংশ।

১৪ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

সনেট-সপ্তক

ইংলণ্ডে, কোনো বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া, জনৈক বঙ্গযুবকের হৃদয় এবং মন সহসা যুগপৎ প্রণয় এবং কবিত্ব-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি পকেট-বুকে পূর্বোক্ত বাহ্যিক এবং মানসিক অবস্থার বিষয় নোট করিয়া রাখেন। তৎপরে সেই নোট অবলম্বনে স্বীয় মনোভাবের বর্ণনা করিয়া ইংরাজি ভাষায় ছয়টি সনেট রচনা করেন। আমি তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এই সনেট কয়েকটি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছি। সনেটগুলির প্রধান গুণ এই যে, তাহার ভাব কিম্বা ভাষায় কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। এতদ্‌ব্যতীত, Ideality এবং Realityর এরূপ অপূর্ব মিশ্রণ, কাল্পনিক এবং বাস্তব জগতের এরূপ ওতপ্রোতভাবে একত্র সমাবেশ, আমি পূর্বে কখনো অন্য কোনো বঙ্গকবির রচনায় দেখি নাই। অথচ কবির হৃদয় যে খাঁটি বাঙালি হৃদয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের পাতায় পাতায় এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মধুর রসে বিগলিত হইয়া অবিরল অশ্রুমোচন করিতে বাঙালি কবি যেরূপ জানে, পৃথিবীর অন্য কোনো কবি তাহার সিকির সিকিও জানে না। বুকের রক্ত জল হইয়া চক্ষু হইতে নির্গত হওয়ার উপরেই যদি বাঙালি কবির কবিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই অপরিচিত যুবকটি বঙ্গদেশের একটি শ্রেষ্ঠ কবি। এই সনেটগুলি পাঠ করিবার সময় সহৃদয় পাঠক অন্তত দু-চার ফোঁটাও চোখের জল ফেলিতে বাধ্য হইবেন। অনুবাদে মূলের ভাষার সৌন্দর্য রক্ষা করা যায় না, এবং সেই কারণে আমি অসম্ভবকে সম্ভব করিবার কোনোরূপ বৃথা চেষ্টা করি নাই। যদি মাছিমারা তরজমা নামক কোনোরূপ পদার্থ থাকে তাহা হইলে আমার এ তরজমা তাই, অর্থাৎ আমি যতদূর সম্ভব অবিকল অনুবাদ করিয়াছি। প্রথম

সনেটটি আমি কবির পকেট-বুকের নোট অবলম্বনে রচনা করিয়াছি, যাহা গদ্য আকারে ছিল তাহা পদ্য আকারে পরিণত করিয়াছি। আমি সেই নোট নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তদ্দৃষ্টে ইংরাজি-ভাষাজ্ঞ পাঠকমাত্রেই দেখিতে পাইবেন যে, অনুবাদস্থলে আমি নিজের কলম চালাই নাই।

Note :

(1) Winding rivulet (2) Brook vocal (3) Rustic bridge (4) Railing (5) Beautiful lady leaning against (6) Playing violin (7) Lawn (8) Rabbit running about (9) Clear stream (10) Feeling heavenly bliss.

অনুবাদক

প্রথম

নীচেতে চলেছে জল আঁকিয়া বাঁকিয়া,
তরল আবেগ-ভরে ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া ;
কানে শুনি তারি গান শুধু কুলুকুলু,
রসাবেশে হয়ে আসে চক্ষু ঢুলু ঢুলু।

উপরেতে ভাঙা সাঁকো, হেরিনু যুবতী
রেলিঙেতে ভর দিয়ে আছে রূপবতী ;
আপন ভাবেতে ভোর বাজায় বেয়ালা—
রূপে মোর ভরে গেল নয়ন-পেয়ালা।

নির্মল নির্ঝর নীর, নাহি তাহে পঙ্ক,
রূপসী চাঁদের পারা শশহীন অঙ্ক,
শশক বেড়ায় ছুটে পেয়ে সমভূমি ;
চাঁদ যদি হাতে পাই একবার চুমি।

সে রূপ বর্ণনা করে বর্ণ নাই বর্গে,
না মরিয়া চলে গেনু একদম স্বর্গে।

৯ সেপ্টেম্বর ১৯১২

দ্বিতীয়

তব হস্তে যন্ত্র করে ভ্রমরগুঞ্জন ;
কভু ধ্বনি শুনি কাছে, কভু বহু দূরে,
কভু লম্ফে ঊর্ধ্বে ওঠে, কভু পড়ে ঘুরে,
জানি নে সে সুর আমি স্বর কি ব্যঞ্জন।

হৃদিতন্ত্রী কিন্তু মম করে ঝন্‌ঝন্‌!
লেগেছে ভাবের নেশা বেয়ালার সুরে,
সংগীতের মদ্যে হয়ে অতি চুর্‌চুরে,
তালে তালে নাচে মোর নয়ন-খঞ্জন।

সেই সঙ্গে নাচে মোর পরান-পুতুল
পাগলের পারা, হয়ে আনন্দে অতুল।

চোখের সুমুখে ভাসে দিবসের চাঁদ,
চাঁদির কিরণ দেয় চৌদিকে ছড়িয়ে,
ভেঙে চুরে সব মোর হৃদয়ের বাঁধ,
কবিতার রস মনে পড়িছে গড়িয়ে।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

তৃতীয়

আমার বুকের কূপে একি তোলপাড় !
এতদিনে বুঝি মনে জাগে ভালোবাসা !
এক বৃন্তে ফুটে ওঠে ভয় আর আশা,
এ জীবনে এল বুঝি প্রথম আষাঢ় !

কখনো আশার জ্বলে বেলোয়ারি ঝাড়,
কভু ঘিরে আসে মনে ভয়ের কুয়াশা,
ও রূপ-মদিরা পিয়ে বাড়িছে পিপাসা,
হৃদয়-মাতাল খায় বুকেতে আছাড় !

কী রস ঢালিলে প্রাণে, হৃদয়ের রাজ্ঞী !
বর্ণনা করিতে নারি, নহি আমি বাগ্মী ।

প্রেমসিন্ধুপানে এবে চলি ভরা পালে,
দোলা খায় অন্তরাত্মা, মুখে নাহি বাণী ।
কি করি, বুদ্ধির হালে পায় নাকো পানি,
দুর্গা বলে ভেসে পড়ি, যা থাকে কপালে !

চতুর্থ

ভালো তোমা বাসিবারে নাহিকো সাহস,
ভয়, পাছে লোকে বলে মোর আছে ছিট-
গগনের তারা তুমি, আমি ক্ষুদ্র কীট !
তোমারে হেরিয়ে শুধু হয়েছি বেহোঁশ ।

কিন্তু যদি হইতাম আমি খরগোস,
এ দেহে পড়িত তব নয়নের দিঠ,
নিশ্চয় ছুটিতে তুমি মোর পিঠ-পিঠ,
ধরা দিয়ে মানিতাম বিনাবাক্যে পোষ ।

দূরে বসি এবে দেখি তব খোলা চুল,
তোমার আমার মাঝে আছে ভাঙা পুল ।

মিলন-আশায় তাই হইয়ে হতাশ,
তোমার রূপের ঢেউ বসে বসে গুনি,
কানে কানে বলে মোরে নিষ্ঠুর বাতাস—
কভু তুমি ও-নারীর হবে নাকো 'উনি' !

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

পঞ্চম

পড়িতেছে আজ শুধু লুটিয়ে লুটিয়ে
আমার মনের পাখি বুকের বাসায়।
কোথা হতে জল এসে নয়নে নাসায়,
ফোয়ারার মতো পড়ে ছুটিয়ে ছুটিয়ে।

মনের দুখের কালি ঘুঁটিয়ে ঘুঁটিয়ে
কবিতা আজিকে লিখি ইংরাজি ভাষায়,
পড়িবে তোমার চোখে ধরি এ আশায়,
কথায় ব্যথার ফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে।

কবি আমি হইয়াছি অবস্থায় পড়ে,
তরণী ছন্দেতে দোলে পড়িলেক ঝড়ে।

ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে মনের বাঁধন,
কবিতায় তাই আজি করি আপসোস।
এখন আমার কাজ শুধুই কাঁদন—
কোথা সেই বাহুলীন, কোথা খরগোস!

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩
কলিকাতা

ষষ্ঠ

আশা ছিল একদিন আমি হেসে হেসে,
বলিব মনের কথা তব কানে কানে,
তোমার দেহের সাদা চুম্বকের টানে
বসিব তোমার আমি অতি কাছে ঘেঁষে !

সে সব প্রাণের সাধ আজ গেছে ভেসে
কোন্ দূর গগনেতে, কেবা তাহা জানে।
গা ঢেলে বিরহে চলি অকূলের পানে,
—আশার ডিঙার মোর গেছে তলা ফেঁসে !

মন আজ বলে শুধু, "কোথা প্রাণসই,
ফোটে যার বেয়ালাতে সংগীতের খই ?"

এ বুকে লেগেছে তার বেয়ালার ছড়ি,
তারি টানে অবিরল চোখে আসে জল।
ভালোবেসে পরদেশে এই হল ফল,
—রহিল বুকেতে চেন— চলে গেল ঘড়ি !

২৭ এপ্রিল ১৯১৩
বালিগঞ্জ

সপ্তম

খুলে যদি দেখ' মোর হৃদয়-ফলক,
দেখিবে সেথায় প্রিয়া, ঈষৎ হেলিয়ে,
চিত্রার্পিতা হয়ে আছে, কুন্তল এলিয়ে,
সুনীল কাচের চোখে না পড়ে পলক।

প্রতি অঙ্গ হতে ছুটে রঙের ঝলক,
মনের আঁধারে দেয় বিদ্যুৎ খেলিয়ে,
বুকের মাঝারে তাই উঠিছে ঠেলিয়ে
প্রাণের মধুর রসে প্রবল বলক!

যদিচ প্রিয়ার ছবি মনে আছে আঁকা,
প্রিয়া বিনে সব মোর লাগে ফাঁকা ফাঁকা

কতকাল র'ব বল শুধু স্মৃতি নিয়ে?
অশ্রুজলে যাক বুকে ছবি ধুয়ে মুছে।
অলীক সাদার মোহ যাক মনে ঘুচে—
করিব স্বদেশে ফিরে কালো মেয়ে বিয়ে।

আষাঢ় ১৩২০

বর্ষা

ছড়া

এ বুঝি আষাঢ় মাস,
তাই ছুটে চারিপাশ
শুধু করে হাঁসফাঁস
পুবের বাতাস।

কালো কালো মেঘগুলো
জল খেয়ে পেট ফুলো,
পুঁটুলি পাকিয়ে শুলো
জুড়িয়া আকাশ।

হাতির মতন ধড়
নাহি তাহে নড়চড়,
নাক ডাকে ঘড় ঘড়
চারি দিক ছেয়ে।

এত হল অন্ধকার
দিবারাত্রি একাকার,
পাখি সব চীৎকার
করে ভয় খেয়ে।

দু হাত না চলে দৃষ্টি,
ধুয়ে পুঁছে সব সৃষ্টি
অবিশ্রাম ঝরে বৃষ্টি
ঝর ঝর ঝরে।

দেখে ভয়ে কাঁপে বুক,
আকাশ ভেংচায় মুখ
বিদ্যুতের সবটুক
জিভ বার করে।

চিল খায় ঘুরপাক,
ডালে বসে কাঁপে কাক,
আকাশেতে বাজে ঢাক
ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙ।

সারস মেলিয়া পাখা
নাচে হয়ে আঁকাবাঁকা,
ময়ূর ধরেছে কেকা,
গায় কোলাব্যাঙ।

হাঁস, রাজ আর পাতি,
খালে বিলে সার গাঁথি
ফুলিয়ে বুকের ছাতি
হেসে ভেসে চলে।

পদচারণ

ব্যাঙদের মক্‌মকি,
বিদ্যুতের চক্‌মকি
দেখেশুনে বক বকি
এক পায়ে টলে।

গাছেদের মাথা ছুঁয়ে
আকাশ পড়েছে নুয়ে
জল ঝরে চুঁয়ে চুঁয়ে
মেঘের চুলের।

শিউলি ভুঁয়েতে লুটে,
কদম উঠেছে ফুটে,
ভিজে গন্ধ আসে ছুটে
কেতকী ফুলের।

ছেলেপিলে মহানন্দ
ঘরে ঘরে হয়ে বন্ধ,
পরস্পরে করে দ্বন্দ্ব
মহা তাল ঠুকে।

পা ছড়িয়ে নারীকুল
উনুনে শুকোয় চুল,
দু নয়ন বাষ্পাকুল
ধোঁয়া ঢুকে ঢুকে।

পদচারণ

মাতিয়া বরষা-রসে,
ভাঙা গলা মেজে ঘষে
কোনো যুবা ভাঁজে কষে
সুরট মল্লার।

কেহ বা মনের ঝোঁকে
কবিতা লিখিছে রোখে,
গেঁথে দিয়ে প্রতি শ্লোকে
কুমুদ কহ্লার।

বলি শুন, ওহে বর্ষা!
আবার যে হবে ফর্সা
এমন হয় না ভর্সা—
না হয় না হোক।

তোমার ওই রঙ কালো,
তোমার ওই রাঙা আলো,
তার বড়ো লাগে ভালো
যার আছে চোখ।

৭ জুলাই ১৯১৩
বালিগঞ্জ

কৈফিয়ত

Terza Rima ছন্দে

শুনাব নূতন ছন্দে মম ইতিহাস,
কেমনে হইনু আমি শেষকালে কবি।
আগে শুনে কথা, শেষে কোরো পরিহাস

যৌবনে বাসনা ছিল, ছুনিয়ার ছবি,
আঁকিতে উজ্জ্বল করে সাহিত্যের পত্রে—
বর্ণের স্বর্ণের লাগি পূজিতাম রবি।

ফলাতে সংকল্প ছিল মোর প্রতি ছত্রে,
আকাশের নীল আর অরুণের লাল—
এ ছুটি বিরোধী বর্ণ মিলিয়ে একত্রে।

দলিত-অঞ্জন কিম্বা আবির গুলাল
অথচ ছিল না বেশি অন্তরের ঘটে—
এ কবি ছিল না কভু বাণীর ছুলাল।

তাইতে আঁকিতে ছবি কাব্য-চিত্রপটে,
বুঝিলাম শিক্ষা বিনা হইব নাকাল।
চলিনু শিখিতে বিদ্যা গুরুর নিকটে।

হেথায় হয় না কভু গুরুর আকাল!
পড়িনু কত-না জানি বিজ্ঞান দর্শন,
ভক্ষণ করিনু শত কাব্যের মাকাল।

সে কথা পড়িলে মনে রোমের হর্ষণ
আজিও ভয়েতে হয় সর্ব অঙ্গ জুড়ে—
এ ভবসিন্ধুর সেই সৈকত-কর্ষণ !

বন্ধ হল গতিবিধি কল্পনায় উড়ে,
গড়িনু জ্ঞানেতে-ঘেরা শান্তির আলয়—
সহসা পড়িল বালি সে শান্তির গুড়ে ।

নেত্রপথে এসে দুটি সুবর্ণ বলয়
সোনার রঙেতে দিল দশ দিক ছেয়ে—
সুশাসিত মনোরাজ্যে ঘটিল প্রলয় !

বলা মিছে এ বিষয়ে বেশি এর চেয়ে,
ছন্দেতে যায় না পোরা মনের হাঁপানি-
এ সত্য সহজে বোঝে দুনিয়ার মেয়ে ।

ফলকথা, কালক্রমে ত্যজি বীণাপাণি,
ছাড়িনু হবার আশা সাহিত্যে অমর ।
হেথায় বাঁচিতে কিন্তু চাই দানাপানি !

পূজাপাঠ ছেড়ে তাই, বাঁধিয়া কোমর,
সমাজের কর্মক্ষেত্রে করিনু প্রবেশ—
শুরু হল সেই হতে সংসার-সমর ।

পরিনু সবারি মতো সামাজিক বেশ,
কিন্তু তাহা বসিল না স্বভাবের অঙ্গে ।
সে বেশ-পরশে এল তন্দ্রার আবেশ ।

পদচারণ

কি ভাবে কাটিল দিন সংসারের রঙ্গে,
স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, জানে হৃষীকেশ
কর্মক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র এক নয় বঙ্গে।

এদিকে রুপালি হল মস্তকের কেশ,
সেই সঙ্গে ক্ষীণ হল আত্মার আলোক—
হইল মনের দফা প্রায়শ নিকেশ।

দেখিলাম হতে গিয়ে সাংসারিক লোক,
বাহিরের লোভে শুধ্ হারিয়ে ভিতর,
চরিত্রে হইনু বৃদ্ধ, বুদ্ধিতে বালক!

এসব লক্ষণ দেখে হইনু কাতর—
না জানি কখন আসে বুজে চোখ কান,
সেই ভয়ে দূরে গেল ভাবনা ইতর।

হারানো প্রাণের ফের করিতে সন্ধান
সভয়ে চলিনু ফিরে বাণীর ভবনে,
যেথায় উঠিছে চির আনন্দের গান।

আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে,
সে দেশে প্রবেশি গেল মনের আক্ষেপ,
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে।

এদিকে সুমুখে হেরি সময় সংক্ষেপ
রচিতে বসিনু আমি ছোটোখাটো তান
বর্ণ সুর একাধারে করিয়া নিক্ষেপ।

আনিনু সংগ্রহ করি বিঘতপ্রমাণ
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্নেট,
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধপ্রাণ।

এ হাতে মুরতি ধরে আজি যে সনেট,
কবিতা না হতে পারে, কিন্তু পাকা পদ্য—
প্রকৃতি যাহার 'জেঠ', আকৃতি 'কনেঠ'।

অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য,
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,
বারো কিম্বা তেরো নয়, পুরোপুরি 'চোদ্দ'!

১৫ অগস্ট ১৯১৩
বালিগঞ্জ

পত্র

শ্রীযুক্ত 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয় স্বকরকমলেষু

১

বলি শুন বন্ধুবর, ঘুণ-ধরা বাঁশে ভর
দেয়া তব মিছে।
জীবনের তিন ভাগ, তার সুর তার রাগ
পড়ে আছে পিছে।
সিকি যাহা আছে বাকি, দিতে নাহি চাহি ফাঁকি,
—অথচ নাচার।
যার অর্থ আমি খুঁজি, ভালো করে নাহি বুঝি—
কি করি প্রচার ?
এ-হেন লেখক নিয়ে, পত্রিকা চালাতে গিয়ে,
ঠেকে যাবে দায়ে।
কল্পনা কাম্বোজ-ঘোড়া, বয়েসে হয়েছে খোঁড়া,
চলে তিন পায়ে।
ভোঁতা হল পঞ্চবাণ, প্রেমের উজান বান
নাহি ডাকে মনে।
সমাজের পোষা পাখি সমাজ-খাঁচায় থাকি,
ভুলে গেছি বনে।
এখন দখিনে বায় শুধ্ মিষ্টি লাগে গায়,
হাড়েতে লাগে না।
মলয়ের মন্দ ফুঁয়ে হৃদয় গেলেও ছুঁয়ে,
হৃদয় জাগে না।

পাপিয়ার কলতান আজো শুনি পাতি কান,
করিনু স্বীকার।
অশরীরী তার গানে আজিকে আনে না প্রাণে
তরুণ বিকার।
বসন্তে কুসুম ফোটে, নিশ্চয় ভ্রমর ছোটে
তার গন্ধ পেয়ে।
মুখ দিয়ে ফুলে ফুলে, কী যে করে অলিকুলে,
দেখি নাকো চেয়ে।
আজিও পূর্ণিমা নিশি ঢেলে দেয় দিশি দিশি
কিরণ শীতল।
কিন্তু তার দিব্যবর্ণ পারে না করিতে স্বর্ণ
মর্তের পিতল।

২

কপালেতে ছিল লেখা, তাই আজ লিখি লেখা,
অবসর পেলে।
কথার নেশায় মাতি, কথায় কথায় গাঁথি,
স্মৃতি-বাতি জ্বেলে।
লেখাপড়া মোর পেশা লেখাপড়া মোর নেশা,
কাজ আর খেলা।
সেই কাজ, সেই খেলা, করিয়াছি অবহেলা.
যবে ছিল বেলা।
এখন চারিটি দিকে রঙ যবে হল ফিকে,
রচি গদ্য পদ্য।

তাহার পনেরো আনা, সবাকারি আছে জানা,
মোটে নয় সচ্ছ।
যে কথা হয়েছে বলা, সেই কথা সেধে গলা,
বলি আরবার।
মনের পুরোনো মাল, মেজে ঘষে করি লাল,
করি কারবার।
হয়তো বা পুরোপুরি, না জেনে করেছি চুরি,
পর-মনোভাব।
অথবা জাওর কাটি, খেয়ে আমি পরিপাটি
সাহিত্যের জাব।

৩

শুনিতে আমার কথা কার হবে মাথাব্যথা,
ভাবিয়া না পাই।
মানুষে কাব্যের গায় আগুন পোয়াতে চায়,
—নাহি চায় ছাই।
আমি চাই সত্য বলি, সত্য মোরে যায় ছলি,
মিথ্যা রেখে হাতে।
কাব্যে চলে মিছা কথা, কাব্যের এ মিছে কথা
লেখা পাতে পাতে।
ভাবকে তরল করা ভাষাকে সরল করা
নয় সোজা কাজ।
মনকে উলঙ্গ করি, এত না সাহস ধরি,
সেটা জানি আজ।

তাইতে বাহিরে আনি,   ঢেকে তার দেহখানি
বাক্য-কিঙখাবে।
বলি— হেরো পেশোয়াজ,   হেন চারু কারুকাজ
আর কোথা পাবে ?
আঁটসাঁট ছন্দোবন্ধ   দিয়ে রচি কটিবন্ধ
মোর কবিতার।
দেখিলে পরখ করি   দেখিবে হয়তো জরি
ঝুঁটো সবি তার।
কবি চাহে নব ধাঁচে   মনের পুতুল নাচে,
সাহিত্য-আসরে।
বাহবা পরের কাছে   নর্তকীর মতো যাচে,
প্রমোদ-বাসরে।
ভাষা ভাব এলো করা,   কবিতাকে খেলো করা
হয় তাহে জানি।
তাই ব'লে শুধু রঙ্গ,   কাব্যে করা অঙ্গভঙ্গ,
ভালো নাহি মানি।
হলে ভাবেতে ফতুর   হই ভাষায় চতুর—
এটি নাহি ভুলি।
কেহ দেয় করতালি   কেহ দেয় খর গালি,
কানে নাহি তুলি।

৪

এবে চাই গলা খুলে   ছলাকলা গিয়ে ভুলে
সাদা কথা বলি।

ত্যজি সব অহংকার, খুলি বস্ত্র অলংকার,
রাজপথে চলি।
কিন্তু সে হবার নয়, চলিতে পাই গো ভয়
সেই পথ ধ'রে।
সে পথের কোথা শেষ নাহি জানি সবিশেষ,
না জানে অপরে।
যা না দেখি, যা না জানি, তাই নিয়ে হানাহানি,
গুরুতে গুরুতে।
সৃষ্টির আসল মানে, কেহ কিছু নাহি জানে,
শেখায় পুরুতে।
জোলো ধর্ম, জোলো নীতি, বেচাকেনা হয় নিতি,
সাহিত্য-বাজারে।
তত্ত্ব তথ্য তন্ত্র মন্ত্র, জন্ম দেয় মুদ্রাযন্ত্র
হাজারে হাজারে।
হয় জ্ঞানী কাটা ঘুড়ি, নয় দেয় হামাগুড়ি
ভুঁয়ে মুখ গুঁজে।
মুখে বলে 'আবি আবি', অন্ধকারে খায় খাবি,
ভয়ে চোখ বুজে।
অথবা টানিয়ে কলকি বলে বিশ্ব মহাভেলকি,
জ্ঞানে যাবে উড়ে।
এদিকে কান্নার রোল, উঠিতেছে অবিরল,
দশ দিক জুড়ে।
মানবের অশ্রুবারি, যাহে না মুছাতে পারি,
সেই জ্ঞান ফাঁকি।

দর্শন বিজ্ঞান তাই, উড়িয়ে কথার ছাই,
কানা করে আঁখি।
তাই কথা বড়ো বড়ো একত্র করিতে জড়ো
ভালো নাহি বাসি।
নাহি লাগে কারো কাজে, বড়ো কথা বড়ো বাজে,
নয় বড়ো বাসি।
ঢের ভালো তার চেয়ে চলে যাওয়া গান গেয়ে
আপনার মনে।
পলে পলে যাহা ফুটে' দলে দলে যায় টুটে,
হৃদয়ের বনে।

৫

মানুষেতে কিবা চায়, কেন করে হায় হায়,
কী তার অভাব ?
কেবা জানে, কেবা বলে, —এই মাত্র বলা চলে
এ তার স্বভাব।
রমণী ধরিলে ক্রোড়ে, সব বুক নাহি জোড়ে
ফাঁক থেকে যায়।
শূন্য মনে বুঝাইতে, শূন্য হিয়া বুঁজাইতে,
আনে দেবতায়।
সে শুধু অনন্ত ধোঁয়া, নাহি দেয় ধরাছোঁয়া
নাহি যায় সরি।
সেই ভয়, সেই আশা, নাহি কোনো জানা-ভাষা
যাহে রাখি ধরি।

পদচারণ

অতৃপ্ত হৃদয় কাঁদে পড়িতে প্রেমের ফাঁদে
ফিরে বার বার।
এই মাত্র আমি জানি, এই মাত্র আমি মানি
জগতের সার।
"জানি মোরা খাঁটি সত্য, ছোটো বড়ো গূঢ় তত্ত্ব
সকল সৃষ্টির।"
ব'লে যারা করে সোর জানে তারা কত জোর
কথার বৃষ্টির।
আমি চাহি শুধু আলো, ভালো নাহি বাসি কালো
অন্তরের ঘরে।
আর জানি এক খাঁটি, পায়ের নীচেতে মাটি
আছে সবে ধরে।
মাটি আর আলো নিয়ে, দিতে চাই দুয়ে বিয়ে,
সসীমে অসীম।
যত কিছু লেখাপড়া, তার অর্থ শুধু গড়া
মাটির পিদিম।
আর নাহি জোটে মিল, হাতে লেগে আসে খিল
চলে না কলম।
মস্তিষ্ক কাতরে চায়, এড়াতে চিন্তার দায়,
ঘুমের মলম।

১১ জুন ১৯১৩
বালিগঞ্জ

দুয়ানি

প্রাণহীন কবিদের বীণার ঝংকার।
বাণহীন ধনুকের ছিলার টংকার ॥

কেবল কথার রাজ্যে বিস্তারে প্রভাব।
ছোটো ছোটো হৃদয়ের বড়ো বড়ো ভাব

ডুব দিয়ে অন্তরের অতল সাগরে।
কেহ বা মুকুতা তোলে, কেহ ডুবে মরে ॥

খুঁজো নাকো সৌন্দর্যের গোড়াকার অঙ্ক
ফুলের গাছের মূলে পাবে শুধু পঙ্ক ॥

শ্রোতা বলে রাগ বাজে শুধু এক তারে।
তবে কেন বাজে তার সাজে ডান ধারে ॥

কাঁদ যদি বসে উচ্চ হিমালয়-শিরে।
প্রতি বিন্দু অশ্রু হবে হাস্যোজ্জ্বল হীরে ॥

অয়স্কান্ত মহাকাশ মনের চুম্বক।
মন যার লোহা, তার সহজ কুম্ভক ॥

দ্বারে এসে অবশেষে রাখ শ্রান্ত কায়া।
পড়েছে মুখেতে তাই কপাটের ছায়া ॥

পদচারণ

বহুকাল তরুতলে আছ ধ্যানে বসি।
জান না পড়েছে সব পাতাগুলি খসি॥

যদিচ অনন্ত বটে সুমুখের পথ।
শেষের আশার বাষ্পে চলে মনোরথ॥

বিশ্বছন্দ গড়ি, দিয়ে পদে পদে যতি।
পদে পদে স্থিতি বিনা নাহি হয় গতি॥

পাও যদি খুঁজে কোথা অসীমের সীমা
দেখিবে সেথায় আছে দাঁড়ায়ে প্রতিমা

৭ অক্টোবর ১৯১৩
বালিগঞ্জ

বনফুল

পত্রপুটে এলে কোথা বনবাসী ফুল ?
অঙ্গরাগ হেরি তব সমুদ্রের নীল,
তোমার পরশে আছে মলয় অনিল—
এ তো নহে কুঙ্কনের সাগরের কূল !
হিমের আলয়ে হেথা বড়ো অপ্রতুল
সুখস্পর্শ সমীরণ, তরল সলিল।
সুকুমার কুসুমের কি আছে দলিল
এত ঊর্ধ্বে উঠিবার, না হলে বাতুল ?
এ দেশে আকাশে ভাসে ধূসর কুয়াশা,
তারি মাঝে মাথা তোলে পর্বতের শৃঙ্গ,
উজ্জ্বল কিরীটে যার হীরক তুষার।
ক্ষীণ প্রাণে ধরি কোন্ প্রস্ফুটিত আশা,
এসেছ এ পরদেশে, যেথা নাই ভৃঙ্গ ?—
বরফের বুকে নাহি তোমার সুসার !

২৪ অক্টোবর ১৯১৩
দার্জিলিং

চেরি পুষ্প

বসন্তের আগমনে আজো আছে দেরি,
পর্বতের স্তরে স্তরে বিরাজে তুষার।
চুরি ক'রে ফিকে রঙ গোলাপী উষার,
লাজ মুখে ফুটিয়াছ ঝাঁকে ঝাঁকে চেরি!
পত্রহীন শাখাগুলি ফেলিয়াছ ঘেরি,
বর্ষিয়া তাহার অঙ্গে কুঙ্কুম আসার।
সে জানে, যে বোঝে অর্থ ফুলের ভাষার,
বসন্তের ঘোষণার তুমি রক্তভেরি!

মর্মর-কঠিন-শুভ্র তুষারের গায়ে
পড়েছে রূপের তব রঙিন আলোক,
পূর্বরাগে লিপ্ত তব কর-পরশনে,
শিশিরে বসন্ত-স্মৃতি তুলেছে জাগায়ে ।
রক্তিম আভায় যেন ভরিয়া ত্রিলোক
শোভিছে উমার মুখ শিব-দরশনে।

২৫ অক্টোবর ১৯১৩
দার্জিলিং

ভালো তোমা বাসি যখন বলি

'ভালো তোমা বাসি' যখন বলি
তোমায় ছলি।
প্রেমের কলি,
মরমে আমার শরমে ভয়ে
ফোটে না রক্তকমল হয়ে।

'ভালো নাহি বাসি' যখন বলি
আপনা ছলি।
প্রেমের কলি,
ভয়ের বাধার আঁধার ঘরে
আশার বাতাসে জীবন ধরে।

ভালো তোমা আমি বাসি না-বাসি,
কাছেতে আসি।
তোমার হাসি,
মনের কোণেতে প্রদীপ জ্বেলে
নিতি নব দেয় আলোক ঢেলে।

তোমা ছেড়ে যবে দূরেতে আসি,
তোমার বাঁশি,
আকাশে ভাসি,

করুণ সুরেতে ভোরে ও সাঁঝে
ব্যথার মতন বুকেতে বাজে ।

-২৩ মার্চ ১৯১৪
বালিগঞ্জ

প্রেমের খেয়াল

শ্রীমান মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কল্যাণীয়েষু

প্রেমের দু-চার কবিতা লিখেছি
লিখি নি গান।
প্রেমের রাগের আলাপ শিখেছি
শিখি নি তান।
কত-না শুনেছি প্রণয়কাহিনী,
কত-না শুনেছি প্রেমের রাগিণী
পাতিয়া কান।
আপন মনের কখনো গাহি নি
কাঁপানো গান।

প্রেমের খেয়াল সহজে মানে না
তাল ও মান।
ছোটা বই আর নিয়ম জানে না
ফুলের বাণ।
প্রেম নাহি মানে আচার বিচার,
গীত নহে তার, সোনার খাঁচার
পাখির গান।
প্রেম জানে নাকো দু বেলা মিছার
করিতে ভান।

পদচারণ

তূরীতে ভেরিতে কখনো বাজে না
তরল তান।
পরীর শরীরে কখনো সাজে না
জরির থান।
আছে যা লুকায়ে ভাষার অন্তরে,
পার যদি দিতে মনের যন্তরে
হালকা টান,
তবে তা আসিবে সুরের মন্তরে
ধরিয়া প্রাণ।

থাকে না কবির সাজানো ভাষায়
ফুলের ঘ্রাণ।
পড়ে না কবির সাজানো পাশায়
মনের দান।
কর যদি তুমি আকাশ-ফুলের
কর যদি তুমি অনন্ত ভুলের
মদিরা পান।
তা হলে গাহিবে প্রাণের মূলের
রসের গান।

২২ মার্চ ১৯১৪
বালিগঞ্জ

দ্বিজেন্দ্রলাল

উদার আঁধার-মাঝে বিদ্যুতের মতো
উঠেছিল ফুটে তব ক্ষিপ্র তীব্র হাসি
ঘনঘোর মেঘে ঘেরা দিগন্ত উদ্ভাসি'।
দেখায়েছ বাহিরের উদারতা কত ॥

গভীর অরণ্য-মাঝে ক্রন্দনের মতো
উঠেছিল বেজে তব মন্ত্র-মন্দ্র বাঁশি
রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুরে সুরে বেদনা উচ্ছ্বাসি।
বুঝায়েছ অন্তরের গভীরতা কত ॥

সে আলো হারিয়ে গেছে এ দৃশ্য ভুবনে,
সে সুর চারিয়ে গেছে এ স্পৃশ্য পবনে ॥

যে আলো দিয়েছ তুমি সহাস্যে বিলিয়ে,
যে সুরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কায়া,
মনের আকাশে কভু যাবে না মিলিয়ে—
রহিবে সেথায় চির, তার ধূপছায়া ॥

২৩ জুন ১৯১৩
বালিগঞ্জ

স্নেহলতা

স্বয়ংবরে বরিয়াছ তুমি বৈশ্বানরে
দেবতার আলিঙ্গন করি অঙ্গীকার।
তব স্পর্শে উচ্ছ্বসিত জীবন্ত শিখার
আভায় তুলিছে আজ দেশ আলো ক'রে।

অপূর্ব হোমাগ্নি জ্বালি বিবাহবাসরে,
দিয়াছ আহুতি তাহে দেহ-মল্লিকার।
'অনন্ত মরণ-মাঝে জীবন বিকার'—
এ সত্য কোথায় পেলে তব খেলাঘরে?

এ জগতে প্রাণ চায় সচ্ছন্দ বিকাশ ;
ফুলের ফুটিতে চাই উদার আকাশ।

দাস মোরা চিরবন্দী শাস্ত্র-কারাগারে,
উন্মুক্ত আকাশ হেরি শুধু ভয় পাই।
জ্বেলেছ যে সত্য বহ্নি মিথ্যার মাঝারে
এ জড় সমাজ তাহে পুড়ে হোক ছাই।

৪ মার্চ ১৯১৪
বালিগঞ্জ

খেয়ালের জন্ম

Terza Rima

বাদশা ছিলেন এক পরম খেয়ালী,
বিলাসের অবতার জাতে আফগান।
দিনে তাঁর নিত্য দোল, রাত্তিরে দেয়ালি।

জীবন তাঁহার ছিল শুধু নাচগান,
—শাসন পালন রাজ্য করিতেন মন্ত্রী—
নর্তকী তু বেলা দিত রূপের জোগান।

ঘিরে তাঁরে রেখেছিল শত শত যন্ত্রী,
কারো যন্ত্র রুদ্রবীণ কারো-বা রবাব—
স্পর্শে যার কেঁপে ওঠে হৃদয়ের তন্ত্রী।

কারো হাতে সপ্তস্বরা, যন্ত্রের নবাব,
ললিত গম্ভীর যার প্রসন্ন আওয়াজ,
মনের সুরের দেয় সুরেতে জবাব।

সেকালে কেবল ছিল ধ্রুপদ রেওয়াজ—
ছয় রাগ হয়েছিল এত দরবারী,
এক পা নড়িত নাকো বিনা পাখোয়াজ।

পদচারণ

সংগীতের ছোটো বড়ো যত কারবারী,
বধিতে সুরের প্রাণ হল অগ্রসর—
দু হাতে উঁচিয়ে ধরে তাল-তরবারি।

একদিন বাদশার জাঁকিয়ে আসর
বসেছে ইয়ার যত আমির ওমরা,
সাকীদের তাগিদের নাই অবসর।

দাড়িগোঁফে কেশে বেশে হোমরাচোমরা
বড়ো বড়ো ওস্তাদেরা করে গুলতান।
হেন সভা নাহি দেখি আমরা তোমরা।

সহসা বিরক্ত স্বরে কহে সুলতান—
'শুনে কান ঝালাপালা হয়েছে আমার,
রাত্তিরে বেহাগ শুধু, দিনে মূলতান!

'ভালো আর নাহি লাগে ধ্রুপদ ধামার।
শুরু করে দাও যবে রাগের আলাপ,
ভুলে যাও শিষ্ট রীতি সময়ে থামার!

'বিলম্বিত তালে যবে কর গো বিলাপ,
মূর্ছনা ঝিমিয়ে পড়ে মূর্ছাকে জিনিয়ে—
নয় তো দুনেতে বক' সুরের প্রলাপ।

'যে গান ছু বেলা গাও ইনিয়ে-বিনিয়ে,
সে গানে জমক আছে নাইকো চমক,
তাল হতে নার' নিতে সুরকে ছিনিয়ে।

'কারিগরি করে যবে লাগাও গমক,
তা শুনে আমার শুধু এই মনে হয়,
রাগ যেন রাগিণীকে দিতেছে ধমক !'

গুণীগণ পরস্পরে মুখ চেয়ে রয়,
বাদশার কথা শুনে সবে হতভম্ব।
হেন সাধ্য নাহি কারো ছুটি কথা কয়।

ভয়েতে সবার গায়ে ফুটিল কদম্ব,
আকাশ পড়িল যেন শিরেতে ভাঙিয়া,
মুহূর্তে হইল চূর্ণ ওস্তাদির দম্ভ।

নর্তকীগণের মুখ উঠিল রাঙিয়া !
লাজে ভয়ে আন্দোলিত তাহাদের বুক,
মুক্ত হল ছিন্ন করি জরির আঙিয়া।

বাদশা কহিল পুনঃ রাঙা করি মুখ—
'নাহি কি হেথায় হেন সংগীত-নায়ক
যে পারে স্থজিতে গীতে নতুন কৌতুক ?'

সভাপ্রান্তে ছিল বসে তরুণ গায়ক,
মদের নেশায় হয়ে একদম চুর—
রূপেতে সাক্ষাৎ দেব কুসুম-সায়ক।

জড়িত কম্পিত স্বরে কহিল, 'হুজুর!
নাহি মানি দুনিয়ার কোনোই বন্ধন—
সার জানি দুনিয়ায় সুরা আর সুর।

'অজানা সুরের এক অধীর স্পন্দন,
আজিকে হৃদয় মোর করিছে ব্যাকুল,
কি যেন বুকের দ্বারে করিছে ক্রন্দন।

'বাঁধা রাগ গাঁথা তাল, এই দুই কূল
ছাপিয়ে ছোটাব আমি সংগীতের বান,
উন্মত্ত উন্মুক্ত হবে সুর বিলকুল!'

এত বলি আরম্ভিল অর্থহীন গান,
তারায় চড়িয়ে সুর মহা চীৎকারি,
আকাশে উড়ায়ে দিল পাপিয়ার তান।

ধ্রুপদেরে পদে পদে দিয়া টিটকারি,
যুবকের কণ্ঠ হতে ঝলকে ঝলক,
উথলি উছলি পড়ে ঘন গিটকারি।

পদচারণ

অবাক বাদশাজাদা না পড়ে পলক,
চোখের সুমুখে ভাসে সুরের চেহারা—
—প্রক্ষিপ্ত চরণ শূন্যে বিক্ষিপ্ত অলক !

গায়ক বাদক ছিল সভায় যাহারা,
মনে মনে গণে সবে ঘটিল প্রলয়—
কোথা সম্ কোথা ফাঁক ভেবে আত্মহারা !

শিহরিল নর্তকীর কর-কিশলয়—
স্ফুরিত সুরেতে লভি কম্পিত দরদ,
শিঞ্জিত হইল ত্রস্ত মণির বলয় ।

শিকল ছিঁড়িয়া সুর ভাঙিয়া গারদ,
শূন্যে ছুটি আক্রমিল স্বর্গের দেওয়াল,
সে গান কৌতুকে শোনে তুম্বুরু নারদ ।

জন্মিল সুরার তেজে সুরের খেয়াল
নেশায় বাদশা হাঁকে— 'বাহবা বাহবা ।'
ধ্রুপদীরা কহে রেগে— 'ডাকিছে শেয়াল !'

২৯ মে ১৯১৪

তেপাটি

Triolet

উষা

উষা আসে অচল শিয়রে
তুষারেতে রাখিয়া চরণ।
স্পর্শে তার ভুবন শিহরে,
উষা হাসে অচল শিয়রে,
ধরে বুকে নীহারে শীকরে
সে হাসির কনক বরণ।
বোসো সখি মনের শিয়রে
হিম-বুকে রাখিয়া চরণ।

মধ্যাহ্ন

আকাশের মাটি-লেপা ঘরে
রবি এবে দেয় আল্‌পনা।
দেখো সখি মেঘের উপরে
কত ছবি আঁকে রবিকরে।
কত রঙে কত রূপ ধরে
ছবি যেন কবিকল্পনা।
বুক মোর আছে মেঘে ভরে
তাহে সখি দাও আল্‌পনা।

সন্ধ্যা

দেখো সখি দিবা চলে যায়
লুটাইয়া আলোর অঞ্চল,
পিছে ফেলে অবাক নিশায়
দেখো সখি আলো চলে যায়।
বিশ্ব এবে আঁধারে মিশায়,
তাই বলে হোয়ো না চঞ্চল।
বেলা গেলে সবে চলে যায়
গুটাইয়া আলোর অঞ্চল;

মধ্যরাত্রি

দেখো সখি আঁধারের পানে
চেয়ে আছে দুটি শুভ্র তারা।
দুটি শিখা বিকম্পিত প্রাণে
চেয়ে আছে স্থিররাত্রি-পানে,
আঁধারের রহস্যের টানে
দুটি আলো হয়ে আত্মহারা।
রাখো সখি জ্বেলে মোর প্রাণে
আলোভরা দুটি কালো তারা।

১০ অক্টোবর ১৯১৪
কার্সিয়াং

মিলন

জান সখি কেন ভালোবাসি
ওই তব ফোটা মুখখানি,
ওই তব চোখভরা হাসি
জান সখি কেন ভালোবাসি ?
যবে আমি তোমা কাছে আসি
ঠোঁটে মোর ফোটে দিব্যবাণী
তাই সখি আমি ভালোবাসি
ওই তব গোটা মুখখানি।

বিরহ

বলি তবে কেন চলে যাই,
শুনে যেন মরমে কেঁদো না।
দুঃখ দিতে, দুঃখ পেতে চাই,
তাই সখি তোমা ছেড়ে যাই।
আমি চাই সেই গান গাই,
সুরে যার উছলে বেদনা।
তাই যবে দূরে যেতে চাই,
সখি মোরে থাকিতে সেধো না।

১২ অক্টোবর ১৯১৪
কার্সিয়াং

ছোটো কালীবাবু

Triolet

লোকে বলে আঁকা ছেলে ছোটো কালীবাবু,
অপিচ বয়েস তার আড়াই বছর।
কোঁচা ধরে চলে যবে, সেজে ফুলবাবু,
লোকে বলে বাঁকা ছেলে ছোটো কালীবাবু।
দিনমান বকে যায়, হয় নাকো কাবু,
সুরে গায় তালে নাচে, হাসে চরাচর।
লোকে বলে পাকা ছেলে ছোটো কালীবাবু,
যদিচ বয়েস তার আড়াই বছর।

১৮ জুন ১৯১৮
বালিগঞ্জ

সমালোচকের প্রতি

তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম,
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে,
তোমাদের কড়া কথা শুনে।
তার চেয়ে ভালো শতগুণে
দেয়া চির লেখায় অলম্,
তোমাদের পড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম।

১ নভেম্বর ১৯১৪

দোপাটি

গাথা সপ্তশতী হইতে অনূদিত

অদর্শনে প্রেম যায়, অতি দরশনে,
পরের কথায়, কিম্বা শুধু অকারণে।

কালেতে দম্পতি-প্রেম এত গাঢ় করে,
যে মরে সে বাঁচে, আর যে বাঁচে সে মরে।

সুখী যে, সে হেসে ভালো পরকে বাসায়।
নিজে ভালোবেসে দুঃখী পরকে হাসায়।

অকৃত্রিম প্রেম নাহি ইহলোক মাঝে।
বিরহ কাহার হয়? হলে কেবা বাঁচে?

সতৃষ্ণ নয়নে শুধু হেরেছি তোমায়।
স্বপনে করিলে পান তৃষ্ণা নাহি যায়।

প্রভুত্ব গোপন ক'রে ব্যক্ত করে রতি,
নারীর বল্লভ সেই— বাকী সব পতি।

দুঃখ দিয়ে সুখ দেয় চিরপ্রিয়জন,
নারীর হৃদয় যাচে হৃদয়-পীড়ন।

ধন্যা যে স্বপনে দেখে দয়িত আপন,
সে বিনে বিনিদ্র আমি, না দেখি স্বপন।

মণ্ডন আধেক সেরে যাও প্রিয়-পাশে,
অসম্পূর্ণ সাজসজ্জা আগ্রহ প্রকাশে।

পতনের ভয়ে ম্লান উন্নতির সুখ,
অধঃপাত হবে জেনে স্তন কালিমুখ।

নিজের অন্তরে গাঁথা ধরি সূক্ষ্ম সুতা,
ঝুলিছে বকুল-সম ঊর্ধ্বপাদ লূতা।

চরণে পতিত পতি, পুত্র পৃষ্ঠে চড়ে,
গৃহিণীর গেল মান, হেসে উল্টে পড়ে।

বিরল অঙ্গুলিপুটে ঊর্ধ্বনেত্রে পান্থ করে পান,
ক্ষীণ হতে ক্ষীণধারে নারী তাহে করে বারি দান।

সিকি

এক হয় বসে থাকো, নয় যাও দূরে,
হয় থাকো চুপ করে, নয় গাও সুরে।
হয় কেঁদে যাক দিন, নয় হেসে খেলে,
—দ্বিধার ধাঁধায় পড়ে আধা হয়ে গেলে

কবিতায় কেহ করে জীবনের ভাষ্য,
কেহ-বা প্রকাশে ছন্দে কল্পনার লাস্য,
জ্ঞানের ঔদাস্য কিম্বা প্রণয়ের দাস্য।
এ-সব ছায়ার গায়ে আলো ফেলে হাস্য।

দুয়ানি

শীতেতে বিবর্ণা দিবা বিশীর্ণা দরিদ্রা
হেসে ফেলে গায়ে মেখে রৌদ্রের হরিদ্রা

অস্পষ্ট মনের ভাবে কবিতার সৃষ্টি,
আগে চাও বাষ্প, যদি শেষে চাও বৃষ্টি ।

লোকে বলে কথা কয়ে কিছুই না হয়,
আমি দেখি কথা ছাড়া কিছুই না রয় ।

বাঙালি জাতির এটি পরম সৌভাগ্য,
হেন লোক নাই যার নাহি বউ ভাগ্য

সনেট

তব দেহশ্লিষ্ট শুক্ল বসন কাষায়,
গোপন করিতে নারে যৌবন-হিল্লোল।
সবাষ্প নয়ন-কোণে কটাক্ষ বিলোল
চকিতে বেকত করে, ভেদি কুয়াশায়,
হৃদয়-আকাশ-বহ্নি, আলোর ভাষায়।
শৈবালে আবৃত তব হৃদয়-পল্বল,
বৃথায় লুকাতে চায় প্রাণের কল্লোল
নিরাশার ছদ্মবেশে ঢাকিয়া আশায়।

শ্রাবণে নদীর বক্ষ আবেগে চঞ্চল,
সংযত করে কি তারে সন্ধ্যার অঞ্চল?
বায়ুর পরশ বিনে তাহার অন্তরে
অবাধ্য যৌবন তোলে রসের তরঙ্গ,
অস্তের গৈরিক-রক্ত বহির্বাস প'রে
ব্যক্ত করে হৃদয়ের উদয়ের রঙ্গ।

আশ্বিন ১৩২৩

খর্সাং

ঝুলে আছ গিরিপল্লী আকাশের গায়,
অটল পর্বতপৃষ্ঠে করিয়া নির্ভর,
ধরে আছে শিরে ব্যোম হিমের কর্পর,
শুয়ে-পড়া বঙ্গভূমি চরণে লুটায়।
ক্ষণে তব হাসিমুখ, ক্ষণে মেঘে ছায়,
ঝরে বুকে সুখে দুঃখে অশ্রুর নির্ঝর।
কানে তব অহর্নিশি বনের মর্মর
গাহিছে ঘুমের গান অস্ফুট ভাষায়।

তোমার কোলেতে বসি আমি ভালোবাসি
হেরিতে বিচিত্রগতি মেঘ রাশি রাশি—
কখনো হাঁসের মতো ভাসে নীলাকাশে,
পলকে আবার ধরে আকার ধুঁয়ার।
ভোরে সাঁঝে মাঝে মাঝে মেঘ-অবকাশে
চোখে পড়ে অলকার সোনার দুয়ার।

২ নবেম্বর ১৯১৪

তত্ত্বদর্শীর সিন্ধুদর্শন

সিন্ধু নহে শান্ত দান্ত স্তব্ধ অহংকারে,
যোগী, কিন্তু মুনি নয়, সশব্দে হুংকারে।
মহানদ মহানাদে বকে না প্রলাপ,
নাদস্বরে মহানন্দে করে শাস্ত্রালাপ।
সিন্ধুপ্রোক্ত গুহ্যশাস্ত্র, গূঢ় তার মানে,
বোঝে যারা শাস্ত্রজ্ঞানী, মূঢ় কিবা জানে।
সমুদ্রের ভাষা শুনি খুলি অন্তঃকর্ণ,
ব্যঞ্জন তাহাতে নাই, শুধু স্বরবর্ণ।
ব্যক্ত নিয়ে ব্যস্ত যারা, বোঝে ভাষা স্পষ্ট,
পঞ্চভূতে বদ্ধ তারা, নাহি জানে ষষ্ঠ।
সিন্ধু কহে, বিশ্বগ্রন্থ উল্টো করে পড়ো,
তা হলে চৈতন্য পাবে, সোজা দিকে জড়।
তত্ত্বজ্ঞানে মত্ত হয়ে, মায়া করি ধ্বংস,
অকূলেতে ভেসে যাই, হয়ে পরমহংস।

এপ্রিল ১৯

শরৎ

মেঘেরা গিয়েছে ভেসে দূর দ্বীপান্তর,
অবাধে পড়িছে ঝরে আলোক রবির।
আকাশ জুড়িয়া ওড়ে সোনার আবির,
ধরেছে সোনালি রঙ সবুজ প্রান্তর।

ক্ষীণপ্রাণ, সুকুমার, সলজ্জ, মন্থর,
বাতাস বহিয়া আনে স্পর্শ করবীর।
সোনার স্বপন আজ প্রকৃতি-কবির
এসেছে বাহিরে তার ত্যজিয়া অন্তর।

শরতের এ দিনের সুবর্ণের মায়া
না ঘুচায় অন্তরের চিরস্থির ছায়া।

আলোর সোনার পাতে মোড়া নভ-দেশ
ফুটিয়ে দেখায় তার অনন্ত নীলিমা।
এ বিশ্বের রহস্যের নিবিড় কালিমা
রঞ্জিয়াছে প্রকৃতির ওই নীল কেশ।

আশ্বিন ১৩২৪

সংসার

শক্তি নিয়ে মানুষের নিত্য পাড়াপাড়ি,
ধন নিয়ে মানুষের নিত্য কাড়াকাড়ি,
মন নিয়ে মানুষের নিত্য আড়াআড়ি,
প্রেম নিয়ে মানুষের নিত্য বাড়াবাড়ি।
ছুটিয়া চলেছে দিন বড়ো তাড়াতাড়ি,
না ফুরোতে সেই দিন, সব ছাড়াছাড়ি।

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯১২

কবির সাগর-সম্ভাষণ

হে সাগর! হে অর্ণব! জলধি মহান!
আমি শুনেছি তোমার গান,
আমি দেখেছি তোমার আলো।
শিয়রে সোনার দীপ তুমি যবে জ্বালো
দিগঙ্গনাগণে দেখে সোনার স্বপন,
সে স্বপনে হয়ে যাই আমিও মগন।

প্রাণময়, গানময়, সিন্ধু তানময়!
তব ধ্যানে হয়েছি তন্ময়।
আমারে শেখাও তব ছড়া,
নিত্য নবছন্দে তব নিত্য ওঠাপড়া।
তব স্পর্শে খুলে গেছে হৃদয়-দুয়ার,
বহে যাক সেই পথে গীতের জোয়ার।

কী রাগিণী গাহ তুমি, সিন্ধু কি ভৈরবী,
হে মুখর প্রকৃতির কবি?
স্নিগ্ধঘোষ তোমার গমক
শুনিয়া এ প্রাণে মহা লেগেছে চমক।
কভু দাও ছাড়ি তান, কভু বা সম্বর,
তোমার সুরেতে আজি কাঁপিছে অম্বর।

হে অনাদি ! হে অনন্ত ! মহা আলোড়ন !
হে বিস্তার যোজন যোজন !
কী হুতাশে উঠিছ ফুঁসিয়া,
কী কথা কহিছ সদা রুষিয়া রুষিয়া ?
বহুভাষী বহুরূপী মহাপারাবার,
মন্ত্র দেহ মোর কানে মায়া সারাবার।

হে বিরাট ! হে উদার ! অসীম চঞ্চল !
ধরিয়াছি তোমার অঞ্চল।
দেহ মোরে তব স্নিগ্ধ কোল,
ক্রোড়ে লয়ে দাও মোরে অহর্নিশি দোল।
তরঙ্গ-অধরে দাও কপোল চুমিয়ে,
পড়ুক আকুল হৃদি অকূলে ঘুমিয়ে।

হে সুন্দর, হে চঞ্চল তরল সাগর !
তুমি মোর প্রাণের নাগর।
তব সনে আজি জলকেলি,
পরাও আমার অঙ্গে নীরাম্বরী চেলি।
তোমার বুকেতে শুয়ে হেরিব আকাশ,
ক্রমে ধীরে নিভে যাবে আলো ও বাতাস !

হে দুর্বার ! হে দুর্ধর্ষ উন্মাদ পাগল !
অট্টরোলে বাজাও মাদল।

অট্ট হেসে করো চীৎকার,
ফুটুক অন্তরে মম সুখ-শীৎকার।
ছুটুক আনন্দ-বন্যা উদ্‌ভ্রান্ত বিপুল,
ভেসে যাক সে বন্যায় মম প্রাণ-ফুল।

এ বিশ্ব ডুবিয়া গেল আনন্দের বানে,
একদৃষ্টে চাহি সিন্ধুপানে।
চেয়ে আছি নেত্রে নির্নিমেষ,
কী জানি কী বেদনার করেছ উন্মেষ,
উঠিছে মরমে বেজে যাহার 'বিগল',
করেছ পাগল সিন্ধু আমায় পাগল।

হে সাগর, করো জোরে তুফান-গর্জন,
আজি মোরে দিব বিসর্জন
ওই তব ক্ষুব্ধ লুব্ধ জলে।
আশা আছে শান্তি পাব অতলের তলে।
ডুব দিয়ে কিন্তু হায়! আমি উঠি ভাসি,
জলের উপরে ফের ফেন- হাসি হাসি।

অন্যান্য কবিতা

কখনো অথবা আমি পঞ্চাশোর্দ্ধে যাব।
যৌবনে এ মনে ছিল জীবন বিরাগ।
বৈকালে সকালে প্রাণে বাড়িত বিলাস।
পেয়েছি যৌবন শেষে আজিও জীবনে॥

অজস্র প্রাণের স্রোত অকূল উদয়
বক্ষিবে সমুদ্রের প্রতি অনুরাগ,
আনন্দ হিল্লোলে চলে কতরূপ রাগ—
বুকে তার ওঠে ফুটে, আলোর চুমুতে॥

মনের ভাবেতে নাহি কোন অবসাদ।
কামনার এ সত্যে নাহি পরিবাদ॥

জীবনের অন্ত যাবে যেদিন কাছে—
(সেই) এই দিন আসে চলে যাই যাই।
পুরাতন মিলে এসে নূতনের সাথ।
এ জীবনে তাই আমি প্রতিদিন বাঁচি॥

দার্জিলিং —
২৬/১০/-৯৩

শ্রী প্রমথ মৈত্রী —

প্রমথ চৌধুরীর হস্তলিপি

পঞ্চাশোধ্বে´

কখনো যাব না আমি পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে।
যৌবনে এ মনে ছিল জীবনে বিরাগ,
সেকালে সকালে প্রাণে বাজিত শ্রীরাগ।
পেয়েছি যৌবনশেষে সঞ্চিত জীবনে॥

আকুল প্রাণের স্রোত অকূল ভুবনে,
বুকে ধরি সুমুখের প্রতি অনুরাগ,
আনন্দহিল্লোলে চলে, কত রূপরাগ।
বুকে তার ওঠে ফুটে, আলোর চুম্বনে॥

কালের ঘরেতে নাই কোনো অপচয়।
ক্রমাগত এ সত্যের পাই পরিচয়॥

জীবনের অঙ্ক বাড়ে যত দিন বাঁচি,
নিত্য নব দিন আসে চলে নাহি যায়;
পুরাতন মিশে থাকে নূতনের গায়।
এ জীবনে তাই আমি প্রতিদিন কাঁচি॥

২৬ অক্টোবর ১৯১৩
দার্জিলিং

সনেট

হাসি যদি কোনোদিন চিরদুঃখ ভুলে,
তোমরা জানিতে চাও কী সুখ-স্বপন
রেখেছি মনের মাঝে করিয়ে গোপন,
কী নব আশার ছবি সেথা রাখি তুলে ?

কাঁদি যদি কোনোদিন আমি মন খুলে,
তোমরা জানিতে চাও, হইয়ে কোপন
কোন্ নিরাশার বীজ করেছি রোপণ
সুগভীর অন্ধকার হৃদয়ের মূলে।

শ্রান্ত মন পায় যবে বিশ্রামের শান্তি
শূন্যমনে শূন্যপানে চেয়ে থাকি যদি,
তোমরা জানিতে চাও কোন্ দৈববল
আনে মোর মুখে স্থির প্রতিমার কান্তি !

আশঙ্কার সন্দেহের নাহিকো অবধি
মর্মহীন ধর্মে যারা হেথায় প্রবল ॥

দুনিয়া

দুনিয়া, বিজ্ঞানে বলে, শুধু কারখানা,
পঞ্চভূতে মিলে যেথা করে নিত্য কাজ ;
ভূতের সামিল মোরা, সেটা জানি আজ,
ভূতের খাটুনি তাই খাটি একটানা।

জ্ঞানমানে এবে জানা, এই যন্ত্রখানা,
যার কলে মোরা চলি, নাহি মানি লাজ ;
কলের পুতুল, নাচি, ধরি নরসাজ।
মানে মোদ্দা বিশ্বে খোঁজা শুধু হারমানা॥

ভূতের ভয়েতে জ্ঞানী বুজে আছে চক্ষে।
হৃদয়-স্পন্দন নাহি দেখে সৃষ্টি বক্ষে॥

অণুতে অণুতে আছে প্রেমের বন্ধন
সেই সূত্রে বাঁধা মোরা বিশ্বনরনারী।
যারে বল কাজ সে তো প্রাণের স্পন্দন।
এ সত্য জানে না কিন্তু যারা জ্ঞানী ভারী॥

২৮ অক্টোবর ১৯১২

নূতন কবি

প্রবাসে চলিয়ে গিয়েছে রবি।
এই ফাঁকে হও নূতন কবি॥
নূতনের আজ জরুর বড়ো।
এই বুঝে নব সাহিত্য গড়ো॥
বড়োর আওতা না বুঝে মাগো,
বড়ো হতে চাও— ফাঁকায় ভাগো॥
সাহিত্যজগতে থাক্-না রাজা।
পূজা নয় তাঁর তামাক সাজা॥
মাছি মারা শুধু নকল করা।
মাছি মারা নয় নিজেই মরা॥
প্রকৃতি কাহারো রক্ষিতা নয়।
সবারি গলাতে জড়ায়ে রয়॥
যে রস তাহার পরশে পাও
নিজের জবানি কবুল খাও॥

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১২

ফরমাশি সনেট

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী করকমলেষু

বিদঘুটে মিল দিলে মোর করপুটে ;
সেই সঙ্গে দিতে যদি ভাবের ইন্ধন
করা যেত কবিতার খিচুড়ি রন্ধন—
এ মিল মেলে না ভাবে পরস্পর জুটে।

নব্য-চিত্রে যায় দেখি অঙ্গ ছরকুটে ;
চিত্রকর হলে লঙ্ঘি স্বভাব-বন্ধন
রেখাক্ষরে দেখাতেম ভাবের স্পন্দন
যুবতী যাহাতে কেঁপে হয় মরকুটে।

তোমার অসহ্য কিন্তু কাব্যে হৃদ্‌রোগ,
তুমি চাও কবিতার করা হঠযোগ।

সৌন্দর্য শক্তির স্ফূর্তি, কদর্যতা জরা,
শিল্প বলে তাই মানো কান্তি যার পুষ্ট ;
কুস্তি করা নিন্দা করে যারা আধমরা ;
লেখার ব্যায়াম হেরি তুমি হও তুষ্ট॥

২০ অক্টোবর ১৯১২
শিলং

পত্র

যবে থেকে তুমি ঢুকেছ নিজের বাটী
লাগিয়ে বসেছ মনের দুয়ারে টাটী ॥
নইলে কি করে রয়েছ মায়ায় কাটি।
কেউ তো তোমার আগলে বসে নি ঘাঁটি ॥৹
আমি তো বিরহে একলা হলুম মাটি।
হৃদয় চৌচির ফুটির মতন ফাটি ॥
ভাব তো পাই নে তোমার মনের খাঁটি—
কখন্ জোয়ার বয় কখন্-বা ভাটি ॥
হয়তো সরেছ কাটিয়া মনের গাঁটি।
খেয়াল গিয়েছে ফেলেছ আমায় ছাঁটি ॥৹
ফের যদি নাহি ফের' মোর এই বাটী
নিশ্চয় মরিব আমি গলে দিয়া শাটী ॥

২৫ অগস্ট ১৯১২

উত্তর

একসঙ্গে কিছুদিন গেছে বেশ কাটি ।
পাশাপাশি ছিনু যেন জুতা দুই পাটি ॥
সে-সব পুরানো কথা কিবা হবে ঘাঁটি ।
একই মধু চিরদিন আমি নাহি চাটি ॥
আমি নহি প্রিয় পাত্র ঘটি কিম্বা বাটি ।
আমি নহি দেহ-সাথী ধুতি কিম্বা শাটী ॥
ঘরে কি কোমরে যারে রাখিবেক আঁটি-
চাবি-দেয়া ভালোবাসা দুদিনেই মাটি ॥
প্রেম-মদে ভরা মোর মন খোলা ভাঁটি ।
যে চায় বিলাই তারে তৃষ্ণা বুঝে বাঁটি ॥
মাত্র মোর এই কাজ বেগারেই খাটি ।
এর জন্যে মিছে কেন কর কাঁদাকাটি ॥

২৫ অগস্ট ১৯১২

অভিসার

আকাশ ছেয়েছে মেঘে ।
বায়ু বহে মৃদু বেগে ।
কূলের ধার
আঁধার ..

ইন্দ্রনীল বিগলিত ।
নদীবক্ষ বিচলিত ।
তরণী দোলে
হিল্লোলে ॥

নাই দাঁড় নাই পাল ।
হাতে শুধু ধরি হাল—
সাঁঝের বেলা
একেলা ॥

ভেসে চলি কূল ছাড়ি ।
কে জানে কোথায় পাড়ি ।
বিদ্যুৎ হাসে
আকাশে

ভেসে চলি আমি একা ।
কূল নাহি যায় দেখা ।

জলের সীমা
নীলিমা

শুনিয়াছি মন-কাছে
ও পারেতে বঁধু আছে
নিশার গায়ে
লুকায়ে ॥

মেঘ ছায়ে বরিষার।
তারি লাগি অভিসার।
পথের শেষ
সে দেশ।

মাঝ-গাঙে ঝড় ওঠে।
তীরবেগে তরী ছোটে
দিগন্ত-পানে
তুফানে ॥

চারি দিকে সব কালো।
হৃদি-দীপে জ্বলে আলো ॥
ঢেকেছে নীর
তিমির

অন্যান্য কবিতা

অনন্ত সাগর ক্ষিপ্ত
মনোরাগ করি দীপ্ত।
হেরিব কান্ত
প্রশান্ত ॥

অগস্ট ১৯১২

পুনশ্চ

সহসা আলোক ফুটে।
দিবাস্বপ্ন গেল টুটে।
হৃদয় জ্বলে
অম্বলে ॥

কাঠের রাজা

প্রস্তাবনা

বীরবল বহুকাল পূর্বে একখানি তিন-অঙ্ক নাটিকা লিখতে চেষ্টা করেছিলেন। আমার বিশ্বাস যে উক্ত নাটিকার প্রস্তাবনা এবং প্রথম অঙ্ক লেখা হয়েছিল। তার পর আমার কোনো বন্ধু সে লেখাটি নিয়ে যান এবং ফেরত দেন নি। তাঁর কাছে তার খোঁজ করা অসম্ভব কেননা তিনি এখন আর ইহলোকে নেই। সেদিন আমার পুরোনো কাগজ ঘাঁটতে হঠাৎ এই অসম্পূর্ণ প্রস্তাবনাটি আবিষ্কার করলুম। এখন যে সেটি প্রকাশ হচ্ছে সে শুধু বীরবলের নাটক-রচনার নমুনা হিসেবে।

[১৩৪৯] বীরবল

কবি। রচেছি অপূর্ব বস্তু করো অভিনয়।
নিজমুখে নিজ স্তুতি করা অবিনয়॥
নইলে বলিতে পারি এর মতো লেখা।
বহুদিন ভূভারতে যায় নাই দেখা॥

নট। প্রশংসা নিশ্চয় পাবে, বন্ধু যত আছে।
ঠেলে তোমা তুলে দেবে সাহিত্যের গাছে॥
নিন্দা যদি কেহ করে কখনো ভুলিয়ে।
তার পিছে দিয়ো তুমি কাগজ লেলিয়ে॥

কবি। নাটকের পরিচয় নাম রানী রাজা।
আর কিছু নাহি হোক আগাগোড়া তাজা॥

নট। কী কাহিনী করিয়াছ তাহাতে বিন্যাস।
শেষেতে বিবাহ আছে অথবা সন্ন্যাস॥
কবি। গল্প-ভাগ অল্প তাতে বেশি ভাগ স্ফূর্তি।
আব্‌ছায়া দেখা যাবে পাত্রপাত্রী-মূর্তি॥
এত বিদ্যে বলি সত্যি নেই মোর ঘটে।
দুনিয়ার ছবি আঁকি রঙ্গালয়-পটে॥
মোর হাতে ভাঙে শুধু কিছুই গড়ে না।
মোর নাট্যে যবনিকা শেষেতে পড়ে না॥
কল্পনা প্রথমে চ'ড়ে পরেতে নামিয়া।
ঘড়ির কাঁটার মতো যাইবে থামিয়া॥
আদি আমি নাহি জানি নাহি জানি অন্ত।
মাঝেতে দেখেছি শুধু প্রকৃতির দন্ত॥
কামড় তাহার সহি দেখি তার হাসি।
তারি পরে রাগ করি ফের ভালোবাসি॥
বেদান্তের অন্তে আসে দন্তের দর্শন।
মম নেত্রে তারি রূপ শ্রবণে ঘর্ষণ॥
নাটকেতে পুরিয়াছি একসঙ্গে ঠাসি।
কিঞ্চিৎ দংশন আর অকিঞ্চিৎ হাসি॥
নট। দৃশ্যকাব্যে দর্শনের স্থান নেই স্পষ্ট।
ছন্দ-বন্ধে ফিলজফি শুধু পায় কষ্ট॥
নাটকের কাজ এক দর্শক হাসানো।
আরেক দর্শক-চক্ষু জলেতে ভাসানো॥
কবি। কোনো কবি মোড়া দিয়ে খোলে মনোকল
অমনি সবার বহে নাকে চোখে জল॥

নাট্যরস কারো ফোটে নানা অঙ্গভঙ্গে।
রঙ্গভূমি ডুবে যায় হাস্যের তরঙ্গে ॥
আমি কিন্তু রোদ বৃষ্টি করিয়াছি মিল।
আমার যা হাসি তাহা কান্নার শামিল ॥

নট। সলিলে উত্তাপযোগে রচিবে ধোঁয়ায়।
দেখা যাবে পরে তাতে কী রস চোঁয়ায় ॥

কবি। এক রস নাহি তাতে শুধু এক ভাবে।
আদি মধ্য অন্ত রস এক সাথে পাবে ॥

নট। ব্যাখ্যা ত্যজি আখ্যায়িকা এবে করো শুরু।
চক্ষের পল্লব ক্রমে হয়ে আসে গুরু ॥
কে-বা রাজা কে-বা রানী কোথা কার দেশ।
কোন্ গুণে নাটকেতে লভিলা প্রবেশ ॥

কবি। পুরাকালে বকদ্বীপে ছিল দারুরাজ।
মুখ তার কুঁদে কাটা অঙ্গে কারুকাজ ॥
রূপেতে মদন রণে দেবসেনাপতি।
ধরণীর রমণীর মনে কেনা পতি ॥
কার্তিকের মতো তবু আইবুড়ো ছিল।
ধরে বেঁধে পাত্রমিত্রে বিয়ে দিয়ে দিল ॥
রক্তে মাংসে গড়া রানী রাজাটি কাঠের।
তাইতে নাটক মম নতুন ঠাঠের ॥

নট। সরস্বতী তব বুঝি টেনে থাকে গাঁজা।

কবি। দারু যদি ব্রহ্ম হয় হতে নারে রাজা ?

গান

রাগিণী কানাড়া। তালফেরতা

আজি সহসা বরষা এল বিমানচারী।
পরি ঘোর বেশ, করি মুক্ত কেশ,
ভরি শূন্য দেশ অতি হুংকারি॥

কত বিদ্যুদ্দাম করি ধুমধাম
এবে অবিরাম ধায় সারি সারি॥

এসে ঝাঁকে ঝাঁকে মেঘে বিশ্ব ঢাকে,
ঘন গুরু ডাকে ঝরে নভ-ঝারি॥

বিনা আজি প্রিয়পতি বিরহ-ব্যথিত-মতি
কত সুন্দরী যুবতী ফেলে অশ্রুবারি॥

হেরি কেহ ঋতুরঙ্গ যাচি দূরপ্রিয়সঙ্গ
ঢাকি নীলবাসে অঙ্গ চলে অভিসারি॥

৫ জুন ১৯১৩
বালিগঞ্জ

স্বরলিপি

মেঘমল্লার । তালফেরতা

ত্রিতাল

জ্ঞা জ্ঞা II { জ্ঞমা জ্ঞমা রা রা | সা সা ন্‌া সা | রা রা পা মপা |
আ জি স হ সা ব র ষা এ ল বি মা ন চা•

॥ [ণা -ধণা ধা]
| (-ধপা -মপা মজ্ঞা -া) } I -া পা পা পা I { মা -পা পা পা |
০০ •০ রী • • রী প রি ঘো • র বে

| -া পা পা পধা | মা -পা পা পর্সা | (-া র্সা র্সা র্সা) } I
• শ ক বি০ মু ০ ক্ত কে • শ প রি

| -া সা র্সা র্সা I র্সা -নর্রা র্সা ণা | -ধা পা পা পধা |
• শ ভ রি শূ ০০ ন্য দে • শ অ তি•

| মা -পা মপা -ধপা | মজ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা Ii
হু ০ স্কা০ ০০ রি০ • "আ জি"

পা পধা II { মা -পা পা পনা | -া না না না | নর্সা -া র্সা র্সনা |
ক ত০ বি • দ্যু দ্দা ০ ম ক রি ধূ • ম ধা•

| -র্সা র্সা না র্সা I র্রা -র্মা র্মা র্রা | -র্সা র্সা র্সা -া |
• ম এ বে অ • বি রা ০ ম ধা য়্

| নর্সা -র্রা র্সা ণা | (-ধা পা পা পধা) } I -ধা পা পা পধা I
সা• • রি সা • রি ক ত• • রি এ সে•

[ণা -ধণা ধা]
I { মা -পা পা পা | -া পা পা পধা | মা -পা পা পর্সা |
ঝাঁ • কে ঝাঁ • কে মে ঘে• বি • ষ ঢা

স্বরলিপি

| (-া র্সা র্সা র্সা) } I -া র্সা র্সা র্সা I র্সা -নর্সর্রা র্সা ণা |
০ কে এ সে ০ কে ঘ ন গু ০ ০ ০ ঙ্ক ডা

| -ধা পা পা পধা | মা পা মপা -ধপা | মজ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা II
০ কে ঝ রে ০ ন ভ ঝা ০ ০ ০ রি ০ "আ জি"

ঝাঁপতাল

।। II { ন্‌া প্‌া | ন্‌া -া ন্‌া | সা সা | সন্‌া -সা সা I
বি না আ ০ জি প্রি য় প ০ ০ তি

I ন্‌া সা | রা -া রা | রসা রা | মজ্ঞা -া জ্ঞা I
বি র হ ০ ব্য থি ০ ত ম ০ তি

I জ্ঞা জ্ঞমা | রা -া রা | সা সা | সন্‌া -সা সা I
ক ত ০ সু ০ ন্দ রী যু ব ০ ০ তী

I রা রা | রমা -রা মা | গমা -পমা | পা -া -া } I
ফে লে অ ০ শ্রু বা ০ ০ ০ রি ০ ০

I { মা পা | ণপা -না না | র্সা র্সা | র্সনা -র্সা র্সা I
হে রি কে ০ ০ হ ঋ তু র ০ ০ ঙ্গ

I র্সনা র্সা | র্সর্রাঃ -র্জ্ঞঃ র্সা | না র্সা | ণধা -ণা পা } I
যা ০ চি দূ ০ র প্রি য় স ০ ০ ঙ্গ

I পর্রা র্রা | র্রা -া র্রর্মা | র্রা র্রা | র্সনা -র্সা র্সা I
ঢা কি নী ০ ল বা সে অ ০ ০ ঙ্গ

I সা সা | সরা -া রা | রসা -রা | মজ্ঞা -া -া II II
চ লে অ ০ ভি সা ০ ০ রি ০ ০

গ্রন্থপরিচয়

১
পূর্বকথা

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যখন 'সনেট-পঞ্চাশৎ' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন তখন সবুজ পত্রের সূচনা হয় নি, তাঁর অপর কোনো গ্রন্থও প্রকাশিত হয় নি, যদিও গদ্যের ক্ষেত্রে তিনি পরবর্তীকালে যে-যোদ্ধৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তার আভাস সাময়িক পত্রের পাঠকের কাছে তখন আর অস্পষ্ট নেই। যে "ঘরওয়ালা ভাষায়" 'আমার বাল্যকথা' (১৩১৯) লিখবার অভিযোগে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য-দরবারে অভিযুক্ত, সেই ভাষার সমর্থনে প্রমথ চৌধুরী লেখেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা" (পৌষ ১৩১৯)— এ বিষয়ে অতঃপর তাঁর কয়েকবর্ষব্যাপী প্রবন্ধমালার প্রথম রচনা; এই প্রবন্ধের পরিশেষেই তিনি প্রথম ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন "আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলকাতার মৌখিক ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে···আধুনিক কলকাতার ভাষা বাঙালি জাতির ভাষা।" এর পূর্বেও "তেল নুন লকড়ি" (১৩১২) প্রবন্ধে তাঁর ভাষার দীপ্তি পাঠককে আকর্ষণ করেছিল; "কথার কথা" (১৩০৯) প্রবন্ধে তিনি সাহস করে বলেছিলেন. "শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যত দূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়"; "মলাট-সমালোচনা"য় (অগ্রহায়ণ ১৩১৯) তাঁর বিদ্রূপনিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন যে-বিদ্রূপের প্রয়োজন ভাগ্যদোষে আজও অক্ষুণ্ণ। মোট কথা, নূতনকালের গদ্যলেখকরূপে, তাঁকে স্বীকার করবার ইচ্ছা না থাকলেও তাঁকে পাশ-কাটানোর পথ নেই, তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এই সময় তিনি সনেট-পঞ্চাশৎ প্রকাশ (১৯১৩। ১৩১৯) করলেন— বঙ্গবাণীর চরণে তাঁর প্রথম গ্রন্থার্ঘ্য। এই কালে বাংলা কাব্যে মসৃণ অনুস্মৃতির পথ ধরে অনেকেই নিশ্চিন্ত মনে চলেছেন— প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়—

"প্রাণহীন কবিদের বীণার ঝংকার
বাণহীন ধনুকের ছিলার টংকার"—

এই চটি বইটিতে অভিনবত্বের সুর লাগল—সনেট-পঞ্চাশতের ভাষায়—

"সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট।"

সরস্বতীর এই 'খড়্গপাণি মূর্তি' যে অনেকেই মনোযোগ করে লক্ষ্য করলেন না, তার কারণ সুতীক্ষ্ণ গদ্যের লেখক বলে তাঁর খ্যাতি, যার সঙ্গে কবিপ্রতিভার সহযোগ সেকালে অন্ততঃ কল্পনাগম্য ছিল না, প্রধানতঃ এইজন্যই হয়তো, সনেট-লেখকরূপে যতটুকু স্বীকৃতি তাঁর প্রাপ্য ছিল তা পাঠকসমাজে তিনি পান নি, তাঁর কবি-কৃতির কৃশতাও সম্ভবতঃ তাঁর কীর্তিনাশের অন্যতম কারণ।

সমাদর লাভ করেছিলেন তিনি প্রধানতঃ তিনজন সাহিত্যিক-প্রধানের কাছে। প্রথম, প্রিয়নাথ সেন।[১] তাঁরই অনুরোধে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সনেট-পঞ্চাশৎ প্রকাশ করেন। প্রিয়নাথ 'সাহিত্য' কাগজের ১৩২০ শ্রাবণ সংখ্যায় এই কাব্য সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধও লেখেন, বর্তমান গ্রন্থে তা পুনঃসংকলিত হল। তাঁর মতে, এই "সনেটগুলি কল্পনাসম্পদে, ভাবপ্রকাশে, ভাষা ও ভঙ্গীগৌরবে এবং শ্রুতিমাধুর্যে এক রবিবাবু ছাড়া সমসাময়িক কোনও কবির রচনা অপেক্ষা হীনশ্রী নহে।"

দ্বিতীয়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৩২০ শ্রাবণ সংখ্যা ভারতী পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ সনেট-পঞ্চাশৎ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা লেখেন, এই রচনাটিও বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হল। এই সমালোচনা প্রকাশিত হবার পর প্রমথ চৌধুরী সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে যে-চিঠি লেখেন সেটিও এই গ্রন্থে মুদ্রিত।

"আমার সনেট যদি কবিতা হয় তা হলে সে কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী"— তবু সনেট-পঞ্চাশতের কবিতা রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল, হয়তো রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতিপ্রাবল্যের ব্যতিক্রম বলেই। 'সনেট-পঞ্চাশৎ' পেয়ে তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লেখেন (৬ মে ১৯১৩)—

"প্রমথর সনেট পঞ্চাশৎ পড়ে আমি খুব বিস্মিত হয়েছি। আমার মেঘদূতের যক্ষবধূর বর্ণনা মনে পড়ল— এই বইখানির কবিতা তন্বী, আর ওর দশনপঙ্ক্তি তীক্ষ্ণ শিখরওয়ালা, একটিও ভোঁতা নেই— 'মধ্যে ক্ষামা', দুটি লাইনের কটিদেশটি খুব আঁট— তার উপরে 'চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা।' এ যেন চোদ্দনলী

হার, একেবারে ঠাস গাঁথুনি আর ভাবটুকু এক-একটি নিরেট মানিকের বিন্দুর মত ঝকঝক করে দুলচে। কেবল আমি এই আশা করচি, কবিত্বের এই সুতীক্ষ্ণতা ক্রমে প্রশস্ত হয়ে আসবে, এর ধারালো নবযৌবন পূর্ণযৌবনের রসভারে বিনম্র হয়ে পড়বে, এবং এখন পাঠকের মনকে প্রতিছত্রে ফুটিয়ে দেবার দিকে এর যে ঝোঁক আছে সেটা আপনি ফুটে ওঠবার দিকেই সম্পূর্ণ হবে, তখন কবিতা এমন নির্মমভাবে নিখুঁত হবে না। বীণাপাণিকে প্রমথ খড়্গপাণি মূর্তিতে সাজাবার আয়োজন করেছেন। ভাষায় ছন্দে ও ভাবের সংযমে এবং নৈপুণ্যে আশ্চর্য শক্তি প্রকাশ পেয়েছে।"--

অনুরূপ পত্র লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে—

"প্রমথ, তোমার সনেট পঞ্চাশৎ পড়ে আমি খুব খুসি হয়েছি। বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি তো দেখি নি। এর কোনো লাইনটি ব্যর্থ নয়, কোথাও ফাঁকি নেই— এ যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাঁটগুলি জহরির নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি— তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝকঝক করচে— কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা হয় নি— কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে। বাংলায় সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছ। ইতি ২২শে এপ্রেল ১৯১৩।"

সনেট-পঞ্চাশৎ উপহার পেয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন—

"তোমার সনেট পাঠে আমি খুব আনন্দ লাভ কল্লুম। বেশ মিঠে কড়া ছাঁদে তুমি তোমার মনের কথাগুলি বিনিয়ে বিনিয়ে বলে মনের ক্ষোভ মিটিয়েচ অতি চতুর রকমে। তোমার ভাষায় একটি বিশেষ চমৎকারিতা এই যে, তোমার ছত্রগুলির মর্ম্মরস পড়বামাত্রেই হৃদয়ে পৌঁছে। আমাদের দেশের সাহিত্যওয়ালারা কবিআনা ঢঙকেই মনে করেন কবিত্বরসের পরাকাষ্ঠা। আমার কিন্তু তাহা দু চক্ষের বিষ। তোমার পুস্তকখানির মধ্যে কবিআনা ঢং একটুও নাই, অথচ রস আছে বেস্ একরকম অম্লমধুর গোছের অতি মনোহর ; তাই তাহা বড্ড আমার ভাল লাগিল।…"মত ত্রিশঙ্কুর"[২] এটা একটু যেন cart before the horse হয়েচে— কিন্তু Rhyme হয়েচে ভাল।

"আত্মকথা[২]তে তুমি লাটাইএর মান বাড়াইয়া দিয়াছ বেজায় বেশী। লাটাই তোমার প্রশংসাবাক্যে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া যদি ঘুড়িকে আকাশ হইতে টানিয়া আনিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে দুই চারি বার লপ্‌টালপ্‌টি করে— তবে ঘুড়ির দশা কি হইবে?…"

প্রমথ চৌধুরীর দ্বিতীয় ও শেষ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে, রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত পদচারণ নাম স্বীকার করে।[৩] এটি তিনি উৎসর্গ করেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে।[৪]

জীবনের শেষভাগে, শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত দুখানি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সনেট-পঞ্চাশৎ ও পদচারণের জন্মকথা বিবৃত করেন, সে দুখানি চিঠিও এই গ্রন্থে মুদ্রিত হল। 'বাংলায় সরস্বতীর বীণায়' তিনি যে 'ইস্পাতের তার চড়িয়ে' দিয়েছিলেন তার স্বভাবগত কারণ চিন্তায় শৈথিল্যের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা; "সনেট লেখবার অন্য কারণও ছিল"—

"ভারতী যাহার কলম ধ'রে
নিতি নব গান রচনা করে,
লিখে রাখে নভে, জলে ও স্থলে,
রূপের বারতা সোনার জলে"

সেই "রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল পড়ে পড়ে আমি একটু বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলুম", "উপরন্তু আমার মনে হয় যে, লেখা অত্যন্ত ফিকে হয়ে আসছে।"—

নিজের কবিতা সম্বন্ধে তিনি 'আশালতাকে উচ্চ মঞ্চে' চড়ান নি— "আমি যে সনেট লিখেছি সে অনেকটা experiment হিসাবে…আমার সনেটের অন্তরে হয়ত art-এর চাইতে artificiality বেশি। তার কারণ Dante প্রভৃতি মহাকবিদের আমি বংশধর নই।" "আমি আসলে গদ্যলেখক তা আমি জানি।"

"কবিতা আমার জানি, যেমন শঙ্কুর,
দু দিনে সবাই যাবে বেবাক ভুলিয়ে!"

তবু তাঁর সনেট-পঞ্চাশৎ ও পদচারণে তিনি যত সামান্য সীমাতেই হোক সাহিত্যে নবত্ব প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন। ভাবালুতার বিস্রস্ত আত্ম-প্রকাশের প্রাবল্যের কালে সংযম ও নৈপুণ্যের আশ্চর্য যে-দৃষ্টান্ত একদা তিনি স্থাপন করেছিলেন সেজন্য উত্তরকালীন কবিরা— যাঁরা স্বভাবকবিত্বে নয়, সচেতন শিল্পকর্মে বিশ্বাসী— এই পূর্বসূরীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন, এই আশা পোষণ করা যেতে পারে।

১ সুধী এই সাহিত্যরসিকের নাম এখন বিস্মৃতপ্রায়, তাই প্রমথ চৌধুরীর ভাষাতেই এঁর সামান্য পরিচয় দিলে অবান্তর হবে না। "তিনি সাহিত্যের একজন যথার্থ গুণগ্রাহী ছিলেন।...আমাদের পাঁচজনের আর-পাঁচ বিষয়ে মন আছে— যথা রাজনীতি সমাজ ধর্ম ইত্যাদি— কিন্তু প্রিয়নাথ সেন এ সকল বিষয়ের আলোচনায় কখনও নিজের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতেন না। একমাত্র সাহিত্যের প্রতিই তাঁর ঐকান্তিক প্রীতি ছিল এবং তিনি তাঁর সকল মন সকল প্রাণ দিয়ে আজীবন একমাত্র সাহিত্যেরই চর্চা করেছেন। সাহিত্যের এই একাগ্র চর্চার ফলে তাঁর সহজ রসবোধ যেমন পরিপুষ্ট হয়েছিল, কাব্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতও তেমনি উদারতা লাভ করেছিল। তিনি জানতেন যে, সাহিত্যজগতে এমন কোনও কষ্টিপাথর নেই, যার সাহায্যে সকলপ্রকার কাব্য সমান যাচিয়ে নেওয়া যেতে পারে। রূপে গুণে Shelley-র কবিতার সঙ্গে Gautier-এর কোনো সাদৃশ্য না থাকলেও, এ-দুই যে কাব্য, এবং উঁচুদরের কাব্য, এ জ্ঞান আমাদের সকলের নেই; তাঁর ছিল। তাঁর মন সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও তৈরি মতামতের অধীন ছিল না বলে, তিনি সাহিত্যে নববস্তুর গুণ গ্রহণ করতে পারতেন— অবশ্য তাতে যদি কোনও গুণ থাকত।"

২ 'আত্মকথা' কবিতা। পৃ. ৫০

৩ "তোমার কাব্যগ্রন্থটির জন্যে একটি নাম একরাত্রে স্বপ্নের মত এসে পরক্ষণে এসে হাতছাড়া হয়ে গেছে। তখন মনে হয়েছিল সেটা ভাল কিন্তু মনে

থাক্‌লে হয়ত তত ভাল লাগ্‌ত না— অতএব অনুশোচনা না করে আর একটা নতুন নাম ভেবে স্থির করলুম। "পদ-চারণ"—ওর সাদা অর্থ পায়চারী। কিন্তু কাব্যের পদ আর প্রাণীর পদ এক নয়। আমাদের দিশী troubadourদেরও চারণ বলে থাকে।"— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র' ৫, পৃ. ২৬২, প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র।

৪ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই গ্রন্থ উপহার পেয়ে চৌধুরী মহাশয়কে কবিতায় যে চিঠি লেখেন তা সবুজ পত্র (শ্রাবণ ১৩২৭) থেকে উদ্‌ধৃত করা গেল—

পদচারণের কবি

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়
সমীপে

রসের যে সিধা পেনু ঢোলে চাঁটি পড়ার শবদে
পাঠাই রসিদ তার, ঢাকে কাঠি থামিবার পরে ;
জানেন তো কুড়ে গোরু চিরদিন ভিন্ন গোঠে চরে,
কুড়েমি কায়েমি যার, ত্রুটি তার ঘটে পদে পদে।
মরম বোঝে না কেউ, মনে ভাবে মেতে আছে মদে
কেউ কয় 'চালিয়ান'! 'কি অসভ্য!' কেউ মনে করে ;
আমি শুধু তুলি হাই,···চিঠির কাগজ নাই ঘরে···
দোয়াতে মসীর পঙ্ক,···এক ফোঁটা জল নাই গঁদে।
লেফাফা দূরস্থ অতি, পোষ্টাপিসে বিকিকিনি তার
লেফাফা-দুরস্ত হওয়া তাই আর হল না আমার।
হুহু ক'রে বেপরোয়া চলে যেতে চায় দিনগুলো,
হা হা করে পদে পদে ওদের কি রাখা যায় ধরে ?
বিশেষ গরম দেশ,···হাঁপ ধরে নাকে ঢোকে ধুলো,
ঢাকে ঢোলে চিঠি তাই লিখি আমি দু'বার বছরে।
গোড়াতে জানিয়ে হাল, ক্ষমা চাই বিনয়-বচনে,
ওগো ছন্দ-চঞ্চরীক! পদচারণের কবিবর!

পায়চারি করে চিত্ত তব গুঞ্জ-গীতি কুঞ্জবনে,
তারিফে ফুটিয়ে তারা, পদে পদে, নিত্য নিরন্তর।

ইতি

ভবদীয়

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে উৎসর্গ করেন তাঁর 'হসন্তিকা' কাব্য।

সবুজ পত্র যখন প্রকাশিত হয়, তার প্রথম সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের সুপরিচিত কবিতা "সবুজ পাতার গান" মুদ্রিত হয়েছিল, তারই শেষ ছত্র text স্বরূপ গ্রহণ করে বীরবল "যৌবনে দাও রাজটীকা" প্রবন্ধ পরের সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

২

সনেট-পঞ্চাশৎ ও পদচারণ

প্রমথ চৌধুরীর পত্র

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত

১৯ নম্বর ষ্টোর রোড
বালিগঞ্জ
২৫ জুলাই ১৯১৩

সবিনয় নিবেদন,

এ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত সনেট-পঞ্চাশতের বিস্তৃত সমালোচনা পড়ে আমি যে খুশি হয়েছি তা বোধ হয় বেশি করে বলবার দরকার নেই। প্রশংসা পেলে তা সাদরে গ্রহণ করবার অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে এবং আমি দেব কি দানব শ্রেণীর জীব নই। প্রথমে সনেট-পঞ্চাশৎ সম্বন্ধে কেউ উচ্চবাচ্য না করাতে স্বয়ং বীরবল তার সমালোচনা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ায়, বীরবল, বন্ধুবান্ধবের উপদেশ এবং আদেশ অনুসারে সে সংকল্প ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এক হাতে গড়ে অন্য হাতে ভাঙাটা লোকে বুদ্ধিমানের কার্য মনে করেন না। এ ক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধবেরা যে সময়োচিত সুপরামর্শ দিয়েছিলেন তার প্রমাণ এ মাসের 'ভারতী' এবং 'সাহিত্য'।

সত্য কথা বলতে গেলে, সনেটগুলি আমি নির্ভয়ে লিখি কিন্তু ভয়ে ভয়ে প্রকাশ করি। তার কারণ, সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় যে, লেখকেরা প্রায়ই পদ্য হতে ক্রমে গদ্যে 'প্রমোশন' পেয়ে থাকেন। স্বাভাবিক অনুলোমের পদ্ধতি অনুসারেই এরূপ হয়ে থাকে। তার উল্টো ব্যাপারটা সাহিত্যজগতের ইভলিউশনের নিয়ম-বিরুদ্ধ; অর্থাৎ কবিতার সঙ্গে বিলোম বিবাহটা গদ্য-লেখকের পক্ষে বৈধও নয় সংগতও নয়। ঐরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করতে গিয়ে কার্লাইল, রাসকিন, জর্জ এলিয়ট প্রভৃতি মহামহারথীদেরও কি দুর্গতি হয়েছে

তা সর্বলোকবিদিত। অসি ছেড়ে বাঁশি ধরবামাত্রই তাঁদের প্রতিভার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়েছে। এই কারণেই সনেটকার হিসেবে আমি সমালোচকদের পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হব এ ভরসা আমার ছিল না। সুতরাং অন্ততঃ তৃতীয় শ্রেণীতে পাস হয়েও আমি যে কবিগোষ্ঠীতে প্রবেশ করবার অধিকার লাভ করেছি, এ আমার পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নয়।

আমার বিশ্বাস যে, সনেট আকার গ্রহণ করাতেই আমার কবিতা গুণী-সমাজে গ্রাহ্য হয়েছে। হুবাহুব নিজের গায়ের মাপে খাট তৈরি করলে তাতে শোওয়া চলতে পারে, কিন্তু ঘুমোনো চলে না। অনেকের বিশ্বাস যে কবিতার উদ্দেশ্য মানুষের মনকে ঘুম পাড়ানো। যদি তাই হয়, তা হলেও এ কথা অবশ্য সকলকে স্বীকার করতে হবে যে অপরকে ঘুম পাড়াতে হলে নিজে জেগে থাকা আবশ্যক। কবি চান আর না চান, সরস্বতীকে সনেটের খাটুলিতে আসন দিলে তাঁকে জাগ্রত থাকতেই হবে। যদি মুহূর্তের জন্যও তন্দ্রা আসে তো তাঁর পতন অনিবার্য। সম্ভবতঃ আমাদের এই ঘুমের রাজ্যে সনেট-পঞ্চাশতের সজাগ ভাবটা লোকের কাছে একটু নতুন লেগেছে। ভালো ছাঁচে ঢালাই করলে সামান্য ধাতুরও মূল্য বেড়ে যায়।

আমি শুধু আপনাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য এ পত্র লিখতে বসি নি। আপনার লেখা পড়ে যে কতদূর সুখী হয়েছি, এবং প্রধানতঃ সে কি কারণে, সেইটে জানানোই আমার উদ্দেশ্য। আমার অবশ্য আজও "প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠিতা" হয় নি। কস্মিন্‌কালেও যে হবে তারও কোনো লক্ষণ দেখতে পাই নে। কিন্তু তাই বলে নিন্দাপ্রশংসায় আমি অতিমাত্র বিচলিত হয়ে পড়ি তাও নয়। কোনও সৎ-বস্তুতে নোঙ্গর না ফেললেও আমার মন কাণ্ডারীহীন তরীর মতো অনুকূল ও প্রতিকূল পবনের ক্রীড়া-কন্দুক হয়ে ওঠে নি। "অহং"কে কেন্দ্রস্থ করে, কতকটা নির্লিপ্তভাবে চার পাশের জিনিস দেখতে আমি চেষ্টা করি। কতটা কৃতকার্য হই সে অপরের বিবেচ্য। সনেট-পঞ্চাশৎ সম্বন্ধে বিশেষ করে আপনি যা বলেছেন তা বাদ দিলেও, আপনি কবিতা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যা বলেছেন, সে সকল কথা বাঙালীর শোনবার এবং মনে মনে আলোচনা করবার

মতো কথা। আপনার লেখা ভাষার গুণে, চিন্তাশীলতায়, এবং স্পষ্টব্যক্তিত্বে, অতি উপাদেয় প্রবন্ধ হয়েছে।

কবি রাজশেখর বলেছেন যে সংস্কৃত-বন্ধ পুরুষ-পরুষ এবং প্রাকৃত-বন্ধ মহিলা-সুকুমার। কথাটা যদি ঠিক হয় তা হলে আমাদের মানতে হবে যে এই উভয়বিধ রচনা হয় আমাদের ভক্তি নয় প্রীতি আকর্ষণ করতে সমর্থ। কিন্তু ভাষা যদি এমন হয় যে পরুষ অথচ পুরুষালি নয়, মেয়েলি অথচ সুকুমার নয়, অর্থাৎ তা যদি নপুংসক ভাষা হয়, তা হলে তার দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়নোই আমাদের কর্তব্য। প্রচলিত শ্রীহীন শক্তিহীন বাংলা গদ্য প্রায়ই পূর্বোক্ত ক্লীবজাতীয়। কিন্তু আপনার গদ্যের মূর্তি আছে, প্রাণ আছে, গতি আছে। আপনার ভাষা তরল হলেও জলো নয়, স্বচ্ছ হলেও বর্ণহীন নয়, পূর্ণ হলেও স্ফীত নয়। সংস্কৃত শব্দ আপনি বাছতে জানেন এবং বাংলা শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে মানিয়ে একহারে গাঁথতে জানেন এবং উপযুক্ত ভাববস্তুর অলংকারস্বরূপ তা প্রয়োগ করতে জানেন। 'লম্বস্তনীর বক্ষে একাবলি যে শোভা পায় না,' এ জ্ঞান আমাদের দেশে পূর্বে ছিল এখন নেই। সুতরাং আমার সবিশেষ অনুরোধ যে আপনি আরও গদ্য প্রবন্ধ লিখে বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে দিন। গদ্য-লেখক ভালো পদ্য লিখতে না পারুন পদ্য-লেখক যে ইচ্ছে করলেই ভালো গদ্য লিখতে পারেন এর প্রমাণ সাহিত্যে যথেষ্ট আছে।

আপনার প্রবন্ধ সম্বন্ধে এই ভাষা ছাড়া অন্য কোনোরূপ প্রশংসার কথা আমার মুখে শোভা পায় না। কারণ তাতে প্রকারান্তরে আত্মপ্রশংসাই করা হবে। সুতরাং প্রবন্ধের আসল মর্যাদা সম্বন্ধে সুখ্যাতি করবার লোভ আমি অবস্থাবিবেচনায় সম্বরণ করতে বাধ্য হলুম।

এখন দুটি একটি বাজে কথা বলি। আপনি লিখেছেন যে এ দেশের শিক্ষিত লোকদের বিশ্বাস যে পেত্রার্কা সনেটের স্রষ্টিকর্তা। এ সম্বন্ধে আমার আপত্তি এই যে এ দেশের শিক্ষিত লোকদের কোন্ বিষয়ে যে কি বিশ্বাস আছে তা বলা অসম্ভব। আমার পরিচিত, কোনও বিলাতপ্রত্যাগত, অতএব শিক্ষিত, কলানুরাগী বক্তৃতাপ্রিয় বঙ্গযুবক আমার প্রতি এই দোষারোপ করেছেন যে,

আমি সনেট-পঞ্চাশতে বড় বেশি অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছি। প্রমাণস্বরূপে তিনি দেখিয়েছেন যে 'পেত্রার্কা' শব্দ প্রকৃতিবাদ অভিধানে পাওয়া যায় না। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। 'শ্লোক' শব্দ শোনবামাত্র যেমন বাল্মীকির নাম মনে পড়ে, তেমনি 'সনেট' শব্দ উচ্চারণ করবামাত্রই পেত্রার্কা স্মৃতিপথে আবির্ভূত হন। পেত্রার্কা এবং সনেট এ দুটি পরস্পর আপেক্ষিক (correlative) শব্দ হয়ে উঠেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। সেই কারণেই আমি যদিচ তাঁর পদানুসরণ করি নি, তবুও পেত্রার্কার চরণ বন্দনা করে আসরে নামি। তৎপরিবর্তে যদি গুইডো ক্যাভালকান্টির দোহাই দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করতুম তা হলে আমি হলপ করে বলতে পারি কোনও পাঠিকা আমার সঙ্গে সপ্তপদী পর্যন্ত করতেও অগ্রসর হতেন না, চতুর্দশ তো দূরের কথা। আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি ফরাসি সনেটের ছাঁচই অবলম্বন করেছি।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ সেন নবম দশম চরণকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়াতে আপত্তি করেছেন।[৫] তাঁর মতে ওরূপ করাতে ধারা ত্রিধা বিভক্ত হয়ে যায়। আমি অস্বীকার করি নে যে কতকগুলি সনেটে আমি মনোভাবকে নবম দশম চরণে গুটিয়ে নিয়ে আবার নূতন করে ছড়িয়ে দিয়েছি। এতে যে কোনোরূপ রসভঙ্গ হয়েছে এমন আমার বিশ্বাস নয়। বংশীধারীর পক্ষে ত্রিভঙ্গরূপ ধারণ করাটা অন্ততঃ এ দেশে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।

এ চিঠি আজ এইখানেই শেষ করি। পুনর্দর্শনায়।[৬]

ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত 6.10.[19]41

কল্যাণীয়েষু,

তোমাকে পরশু একখানি বড় চিঠি লিখেছি। ফরাসী সাহিত্যের কোনো প্রভাব যদি আমার মনের উপর থাকে, তা হলে সে প্রভাব আমি unconsciously আত্মসাৎ করেছি। সজ্ঞানে নয়।

এখন আমার সনেটের জন্মকথা বলছি। চিত্তরঞ্জন দাসের ভ্রাতা P. R Das আমাকে সনেট লিখতে অনুরোধ করেন, তাঁর কথামতো আমি Ronsard প্রভৃতি ফরাসী কবিদের পদানুসরণ করে সনেট লিখতে শুরু করি। ফরাসী সনেটের সঙ্গে ইতালীয় সনেটের প্রভেদ এই যে, দুই সনেটেই প্রথম অষ্টক সমান। শেষ ষষ্ঠকে একটু প্রভেদ আছে। ফরাসীরা ছয়কে দুই ভাগ করেছেন। প্রথম একটি দ্বিপদী পরে একটি চতুষ্পদী। সনেটের technique বড় কঠিন অন্তত: আমার পক্ষে। ফরাসী সনেট গড়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই আমি ঐ formটাই নিই। ওরই মধ্যে একটু সহজ বলে।

আমার লেখা সনেট লোকে ছেলেখেলা বলে প্রত্যাখ্যান করেন— এবং মাসিক পত্রে প্রকাশ করতে চান নি নিতান্ত খেলো বলে। তখন রবীন্দ্রনাথ বিলেতে— গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করছেন। সকলে প্রত্যাখ্যান করলেও জ্যোতিকাকা মহাশয় আমাকে ওর প্রশংসা করেছিলেন এবং ভারতী পত্রিকায় আমার খাতিরে চারটি সনেট প্রকাশিত হয়।[৭] তার পর প্রিয়নাথ সেনের অনুরোধে আমি সনেট-পঞ্চাশৎ প্রকাশ করি। তিনিই ছিলেন আমার রচিত সনেটের আদি গুণগ্রাহী।

রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন বিলেতে। আমার শ্যালক সুরেন্দ্রনাথ সেই সময়ে একবার কিছুদিনের জন্যে Insurance আপিসের কাজে বিলেত গিয়েছিলেন— আর তাঁর কাছে একখণ্ড সনেট-পঞ্চাশৎ ছিল। সেটি পড়ে তিনি আমার স্ত্রীকে আমার কবিতার অতি-প্রশংসা করে একখানি চিঠি লেখেন। আর তার পরেই আমাকে একখানি চিঠি লেখেন। তাতেও আমার সনেটের অতিপ্রশংসা ছিল। এ দুই চিঠি পেয়ে আমি যারপরনাই খুশি হই। এবং চিঠি দুখানি দু-চারজনকে দেখাই বিশেষত: তাঁদের যাঁরা সনেট-পঞ্চাশৎ নিয়ে ঠাট্টা করতেন। সে চিঠি পড়ে তাঁরা নীরব হয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠি পড়ে আমিও একটু অবাক হয়ে যাই। কেননা আমার সনেট যদি কবিতা হয় তা হলে সে কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী।

রবীন্দ্রনাথের Lyric মূলত: গীতধর্মী— তার flow অসাধারণ। সনেট হচ্ছে

আমার মতে sculpture-ধর্মী— এর ভিতর উদ্দাম flow নেই। যেটুকু গতি আছে তা সংহত ও সংযত। সনেটের ভিতর এমন কোনো তোড় নেই যা পাঠকের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সনেট প্রতিমাধর্মী। অবশ্য আমি এ কথা বলতে চাই নে— আমার প্রতি সনেট একটি প্রতিমা। কিন্তু Dante [প্রভৃতি] বড় কবিদের গড়া সনেট তাই। এবং এর সৌন্দর্য অনেকটা technique-এর উপর নির্ভর করে। অবশ্য এর ভিতর যদি প্রাণ থাকে। সে প্রাণ অবশ্য সনেটের ভিতর অন্তঃশীলা ভাবে বয়। Emotionকে লাগাম ছেড়ে দিলে সনেট গড়া যায় না। আমার এ মত গ্রাহ্য কি না তা অবশ্য বলতে পারো। একটি কথা কিন্তু ঠিক, সনেট গান নয়।

সনেট লেখবার অন্য কারণও ছিল— রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল পড়ে পড়ে আমি একটু বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলুম। তার প্রমাণ আমার একটি অপ্রকাশিত কবিতায় আছে।[৮] সেটি তুমি কলিকাতায় ফিরে এলে দেখাব। উপরন্তু আমার মনে হয় যে, লেখা অত্যন্ত ঢিলে হয়ে আসছে।

কবিতা বস্তুকেই আমরা আর্টের কোঠায় ফেলি। সনেটে এই আর্ট নামক গুণই প্রধান লক্ষ্য করবার জিনিস। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বড় কবিদের কবিতায় emotionই হয়ত আর্টকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে আছে। কিন্তু art অনেকটা বন্ধনের সামগ্রী। আমি যে সনেট লিখেছি সে অনেকটা experiment হিসেবে। যদি তা সত্ত্বেও আমার কতকগুলি সনেট যদি কবিতা হিসেবে উতরে থাকে তা এই সনেটের বাঁধাবাঁধি নিয়মের গুণে। আমার সনেটের অন্তরে হয়ত art-এর চাইতে artificiality বেশি। তার কারণ Dante প্রভৃতি মহাকবিদের আমি বংশধর নই। ভালো কথা, আমি Dante-র বার বার নামোল্লেখ করছি কেননা তাঁর Vita Nuova সনেটগুলি প্রতিটি একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ছবি।···

প্রমথ চৌধুরী

5. 11. [19]41
Ballygunge

কল্যাণীয়েষু

সনেট-পঞ্চাশতের জন্মকথা তোমাকে ইতিপূর্বে লিখে জানিয়েছি। এখন পদচারণের কথা বলছি। সনেট-পঞ্চাশৎ সবুজ পত্রের প্রকাশের পূর্বে বেরিয়েছিল পদচারণ তার পরে। রবীন্দ্রনাথ তখন দেশে ফিরেছেন। আর পদচারণ তিনিই দেখে আমাকে ছাপতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এর কতকগুলি কবিতা সবুজ পত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল।

পদচারণের কতকগুলি সনেট পূর্বের লেখা যেগুলি আমি সনেট-পঞ্চাশতে ছাপি নি। ও পুস্তিকার প্রথম সনেটটি বোধহয় আমার প্রথম লেখা। ওর form ঠিক হয় নি। প্রথম চৌপদীর মিল দ্বিতীয় চৌপদীতে রাখতে পারি নি। আর কটি পুরো ইতালীয় সনেটের অনুরূপ। সনেট-পঞ্চাশতের প্রতি সনেটই ফরাসী সনেটের আদর্শে লেখা। প্রথমে দুটি চৌপদী তার পর একটি দ্বিপদী তার পর আর একটি চৌপদী। ইতালীয় সনেটে কিন্তু ত্রিভঙ্গ নয়। প্রথম আট ছত্র তার উত্তমাঙ্গ আর শেষ ছ লাইন তার অধমাঙ্গ। এ ধরণের সনেট লেখা আরও কঠিন। মধ্যে হাঁফ ফিরবার অবসর পাওয়া যায় না। পদচারণে চৌপদীও আছে ত্রিপদীও আছে। আর সে কালে ওই ত্রিপদীটি লোকের খুব ভালো লেগেছিল। তা ছাড়া Terza Rima ও Triolet লিখতেও চেষ্টা করেছি। Terza Rima যে কেন লিখতে গেলুম মনে পড়ে না। ইংরাজী ভাষায় ও-ছাঁদের কবিতা নেই। বোধহয় একমাত্র Browningএর The Statue and the Bust ছাড়া। আমি পরে আবিষ্কার করেছি যে Dante-র Divina Comedia আগাগোড়া Terza Rimaয় লেখা। যেন ও-ছন্দ পয়ারের স্বগোত্র। কিন্তু আমি কথাকে ও-ছন্দে লেখা অসম্ভব কঠিন মনে করেছি। একটি Terza Rima লিখতেই মাথা খারাপ হয়ে যায়। প্রতি তিন ছত্রের মধ্যে এক ছত্র unrhymed থাকে— আর পরের ত্রিপদীতে তার মিল টেনে

আনতে হয়। সনেট চৌদ্দ ছত্রে লিখেই খালাস— কিন্তু Terza Rimaয় শেষ পর্যন্ত ছুটি নেই।

Triolet লেখাও কঠিন— তার পুনরুক্তির জন্য। এ দুই হচ্ছে experiment —আর এ দুই বিষয়েই আমি পাস হয়েছি। অর্থাৎ হাতের পাঁচ রেখেছি। তা ছাড়া দেশী ছন্দ নিয়েই experiment করেছি— তবে কতটা কৃতকার্য হয়েছি বলতে পারি নে।

রবীন্দ্রনাথ আমাকে সেকালে বলেছিলেন যে পদচারণের মতো উজ্জ্বল কবিতার বই বাংলায় আর দ্বিতীয় নেই। উজ্জ্বল মানে যাই হোক।

আমি আসলে গদ্যলেখক তা আমি জানি। কিন্তু এই Rhymeএর চর্চা করলে শব্দের পুঁজি বেড়ে যায়। অনেক শব্দ বাদ দিতে হয় আর-একটি শব্দের সঙ্গে মেলে না বলে। আমার কবিতা লেখার ভিতর এ উদ্দেশ্যও বোধ হয় ছিল।

এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারছি নে। আমি যে কেন হঠাৎ কবি হয়ে উঠি তার কারণ এই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

৫ প্রিয়নাথ সেন লিখেছিলেন—

"প্রায়ই তাঁহার প্রত্যেক সনেটে নবম ও দশম চরণ একটি সম্পূর্ণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকার-প্রাপ্ত, এবং অনেক স্থলে শেক্সপীরীয় সনেটের অন্তিম পয়ারেরই অনুরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পত্রলেখা' নামক অপরপক্ষে সুন্দর সনেটের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও কোনো কোনো ফরাসী কবির রচিত সনেটে নবম দশম চরণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকারপ্রাপ্ত, কিন্তু দশম চরণে ভাবের ছেদ কোথাও তো দেখি নাই।…ইহার ['পত্রলেখা'র] অষ্টকের শেষ চরণে ভাবের বৈধ বিরাম হইলেও, নবম চরণে নবপ্রবর্তিত ভাবতরঙ্গ সনেটের অবশিষ্ট অংশে ব্যাপ্ত না হইয়া দশম চরণেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া শেষ হইয়াছে। একাদশ চরণে

আবার ভাবের নূতন আবর্তন। ইহাতে ভাবস্রোত ত্রিধাবিভক্ত হইয়া প্রখরতা ও গভীরতা হারাইয়াছে। সনেটটিও তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া না মিলটনীয় সনেটের পূর্ণ নিটোল গোলকত্ব লাভ করিয়াছে— না পেত্রার্কীয় সনেটের তাললয়ব্যবচ্ছিন্ন উত্থান-পতনের বিচিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

৬ ছন্দ-আলোচনায় পুনর্দর্শন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা' সভায়, ও সবুজ পত্রের (ভাদ্র ১৩২৫) পৃষ্ঠায়, প্রমথ চৌধুরীর 'পয়ার' প্রবন্ধে— 'কবিবর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্ব-করকমলেষু'।

৭ 'সাহিত্যে'ও কয়েকটি প্রকাশিত হয়। 'সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী' দ্রষ্টব্য।

৮ এই গ্রন্থের 'অন্যান্য কবিতা' বিভাগে মুদ্রিত 'নূতন কবি' দ্রষ্টব্য।

৩

সনেট-পঞ্চাশৎ

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ফরাসীদেশে বসিয়া, বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন। যে শক্তিমান পুরুষ বাংলা পয়ারের পায়ের বেড়ী ভাঙিয়া অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তিনিই আবার আষ্টে-পৃষ্ঠে মিল-বিশিষ্ট সনেট চালাইলেন। যিনি পুরানো আইন ভাঙিয়া বিদ্রোহের নিশান উড়াইয়াছিলেন, 'গদি' পাইয়া মসনদে বসিয়া, তিনি স্বয়ং যে আইন প্রণয়ন করিলেন তাহাতে কড়াকড়ির বেজায় বাড়াবাড়ি। মাইকেলের পর, বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যাঁহারা বাংলা ভাষায় সনেট লিখিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই সনেটের মূল চেহারা বিগড়াইয়া ফেলিয়াছেন। কেবল শ্রীমতী কামিনী রায়ের কয়েকটি সনেট গঠন হিসাবে নিখুঁত। সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার, নানা ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় "সনেটের কঠিন বন্ধন" বজায় রাখিয়া 'সনেট-পঞ্চাশৎ' নামে একখানি বহি বাহির করিয়াছেন। পুস্তকখানির পরিচয় দিবার পূর্বে, সনেটের সঠিক পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। কারণ সাধারণত যাহা সনেট নামে চলে তাহা সনেটের বিকৃতি। এই অবসরে সনেটের যথার্থ আকৃতিটার সহিত পরিচিত হওয়া মন্দ নয়।

সনেটের আকৃতি

'সনেট' মানে শব্দ-শিল্পাত্মক সংগীত। সনেটে মোট চৌদ্দটা পঙ্‌ক্তি, তাহা মধু-প্রদত্ত 'চতুর্দশপদী' নামেই প্রকাশ। ইহার মধ্যে আবার দুইটা ভাগ আছে। প্রথম আটটা পঙ্‌ক্তিকে বলে octave ; ইহাকে আমরা বাংলায় বলিব অষ্ট পঙ্‌ক্তিক বা অষ্টদল পদ্ম। শেষ ছয়টা পঙ্‌ক্তির নাম sestet ; বাংলায় ষট্‌-পদক। অষ্টদলের প্রথম পঙ্‌ক্তির সঙ্গে চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম পঙ্‌ক্তির মিল থাকা নিয়ম ; এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির সঙ্গে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পঙ্‌ক্তির মিল থাকাই রীতি।

ষট্‌পদকের ছয়টা পঙ্‌ক্তির বিন্যাস সম্বন্ধে নানামুনির নানামত। সনেটের আদি জন্মভূমি ইতালিতেই এই অংশের তিন চার রকম মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—

১. প্রথম ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে মিল, দ্বিতীয় ও পঞ্চমে মিল এবং তৃতীয় ও ষষ্ঠে মিল। ২. প্রথমে পঞ্চমে, দ্বিতীয়ে চতুর্থে এবং তৃতীয়ে ষষ্ঠে মিল। ৩. প্রথমে তৃতীয়ে পঞ্চমে মিল এবং দ্বিতীয়ে চতুর্থে ষষ্ঠে মিল। ৪. প্রথমে তৃতীয়ে চতুর্থে ষষ্ঠে মিল এবং দ্বিতীয়ে ও পঞ্চমে মিল। ষট্‌পদকের এই চারিটি মূর্তিই স্বয়ং পেত্রার্কার মূল রচনার মধ্যে দেখিয়াছি।

এইখানে 'সোনেত্তো' বা সনেটের প্রথম প্রবর্তন সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের বিশ্বাস পেত্রার্কা সনেটের জন্মদাতা। কিন্তু পেত্রার্কার জন্মের অন্তত অর্ধশতাব্দী পূর্বে যে সনেটের জন্ম সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দান্তে (খ্রী ১২৬৫-১৩২১), দারেৎসো (১২৩০-৯৪), রুস্তিকো দি ফিলিপ্পো (১২৩৫-৯৭) এবং গুইদো কাভাল্‌কান্তির (১২৫৫-১৩০০) রচনাবলীর মধ্যে অনেকগুলি করিয়া সনেট আছে। এক দান্তে ভিন্ন এই তিনজনই পেত্রার্কার জন্মের (১৩০৪ খ্রীস্টাব্দের) পূর্বে মানবলীলা সংবরণ করেন। সুতরাং পেত্রার্কার দাবি টিঁকিতেছে না। তবে কবিত্ব হিসাবে যে পূর্বজ কবিগণের সনেট অপেক্ষা পেত্রার্কার সনেট উচ্চ সে বিষয়ে কোনো ভুল নাই। তদ্‌ভিন্ন, পেত্রার্কা ও তাঁহার আরাধনার সামগ্রী সুন্দরী লরার দিব্য-প্রণয়ের অবদান— যাহা তাঁহার সনেটের প্রাণ— সেই অপূর্ব রোম্যান্টিক কাহিনী কবিকে এবং তাহার সঙ্গে তৎকালে-অখ্যাত সনেট-রচনা পদ্ধতিকে য়ুরোপের সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। সেইজন্যই সাধারণের বিশ্বাস, পেত্রার্কা সনেটের সৃষ্টিকর্তা। অদৃষ্টবাদী হইলে বলিতাম লোকটার যশোভাগ্য খুব। কলম্বস যে মহাদেশের আবিষ্কার করিলেন তাহার নাম হইল পরবর্তী পর্যটক আমেরিগো ভেস্‌পুচ্চির নামের অনুসারে— আমেরিকা!

পেত্রার্কার পরবর্তী ইতালীয় কবিদিগের মধ্যে বোয়ার্দো, বোক্কাচ্চিয়ো,

লোরেঞ্জো দে মেদিচি, আরিয়াস্তো, তাস্‌সো, ফিলিকায়া এবং মেতাস্তাসিয়ো যে-সমস্ত সনেট রচনা করেন তাহা ছন্দ হিসাবে পেত্রার্কার সনেটের অনুরূপ। আল্‌ফিয়েরির সনেট একটু স্বতন্ত্র। আমাদের মাইকেল মধুসূদনের কতকগুলি সনেট আল্‌ফিয়েরির ছন্দের দৃষ্টান্তে রচিত বলিয়া বোধ হয়। গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে নিজ ইতালিতেই উগো ফোস্কোলো, কার্দুচ্চি প্রভৃতি কয়েকজন আধুনিক কবি আল্‌ফিয়েরির পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে সনেটের প্রবর্তক স্যার টমাস উইয়্যাট্‌। তাহার পর হইতে সারে, স্পেনসার, শেক্‌সপীয়র, মিল্টন, কাউপার, ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ, বায়রন, শেলি, কীটস্‌, ব্যারেট ব্রাউনিং, ম্যাথু আর্নল্‌ড প্রভৃতি অনেকেই সনেট লিখিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে মিল্টনের এবং কীটসের অধিকাংশ সনেট ছন্দ হিসাবে খাঁটি, অর্থাৎ ইতালীয় আদর্শের অনুরূপ। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের কতকগুলি নিখুঁত, কতকগুলি অদ্ভুত। শেক্‌সপীয়রের সনেট কবিতা হিসাবে চমৎকার হইলেও ছন্দের হিসাবে ইতালীয়ের ধার দিয়াও যায় না।

স্পেনের সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার লোপে দে-ভেগা সনেটের উপর একটি কৌতুকজনক সনেট লিখিয়াছিলেন; ইঁহার রচনাপদ্ধতি ইতালীয় আদর্শের অনুরূপ। আদিম সনেটের প্রকৃত মূর্তি দেখাইবার জন্য ছন্দ বজায় রাখিয়া নিম্নে উহার অনুবাদ দেওয়া গেল—

সনেটের উপর সনেট

সনেট লিখিতে প্রিয়া হাস্যমুখে ফর্মাইল মোরে,
সনেট লেখার মতো জ্বালা কিন্তু ত্রিভুবনে নাই।
সনেটে চৌদ্দটা মাত্র চোখা চোখা পঙ্‌ক্তি থাকা চাই—
এরি মধ্যে দেখি তার তিনটা ফেলেছি ব্যয় করে।

ভেবেছিনু মিল্‌ দিতে আজি মোর যাবে মাথা ধ'রে,
এবে দেখি— আরে একি! পৌঁছেছি দ্বিতীয় শ্লোকে, ভাই

'ষট্-পদের' আদ্যপদে একবার যদ্যপি পৌঁছাই—
এ 'অষ্ট-পঙ্‌ক্তির' চিন্তা— স্পষ্ট দেখি— যাবে দূরে স'রে।
সদ্য পৌঁছিলাম, দেখ, ষট্‌পদের আদ্য ত্রিপঙ্‌ক্তিতে;
আহ্লাদী লেখনী মোর বেগে ধায় মুখে মাখি' মসী;
প্রথম ত্রিপঙ্‌ক্তি শেষ! তা-তা-ধিন্! ধিন্-তা! তা-ধিনা!

অন্ত্য-ত্রিপঙ্‌ক্তিতে এনু— ডগমগ হরষিত চিতে,
নাচিতে নাচিতে নেমে— এই এল পঙ্‌ক্তিত্রয়োদশী;
এই তো কাবার! ধর! গুণে দেখ— চৌদ্দ হল কি না।

পেত্রার্কার অধিকাংশ সনেটের আকার ঠিক এইরূপ।

ইংলণ্ডের মতো ফরাসিদেশেও বহুদিন হইতে ইতালীয় সনেট-পদ্ধতি অনুকৃত হইয়া আসিতেছে। বোধ হয় রঁসার্দের সময় হইতে ফরাসি ভাষায় সনেটের চাষ শুরু হইয়াছে। সেখানে সনেটের পূর্বার্ধ অর্থাৎ প্রথম আট পঙ্‌ক্তির বিন্যাস অবিকল ঠিক ইতালির সনেটের মতো। কিন্তু শেষ ছয় পঙ্‌ক্তির বিন্যাস ঈষৎ বিকৃত হইয়াছে। ফরাসি কবিরা সনেটের নবম ও দশম লাইনে মিল দিয়া সেটিকে আলাদা করিয়াছেন এবং ভাব-বিকাশের সুবিধার অনুসারে ওই দুইটা লাইন কখনো-বা পূর্বার্ধের সঙ্গে জুড়িয়া দেন, কখনো-বা উত্তরার্ধের স্কন্ধে চাপান। কখনো সাতনরের ধুকধুকি, কখনো চন্দ্রহারের থামি। ফরাসি আলংকারিকদের মতে এইরূপ করাই সমীচীন। ইহাতে, পড়িতেও বোধ হয় মধুরতর শোনায়। জর্মানির হায়েন, ইংলণ্ডের সুইন্‌বার্ন এবং আলোচ্য 'সনেট-পঞ্চাশতে'র কবি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এই ফরাসি পদ্ধতির অনুসারেই সনেট রচনা করিয়াছেন।

মাইকেলের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হওয়া অবধি, বাংলাদেশের অনেক কবিই সনেট লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'চৈতালি' 'নৈবেদ্য' ও অন্যান্য নানা গ্রন্থে প্রকাশিত সনেটগুলিই যে শ্রেষ্ঠ তাহা বলা বাহুল্য। তবে সেগুলি ছন্দ হিসাবে ইতালীয় সনেটের মতো নয়। 'কড়ি ও

কোমলে'র কতকগুলি সনেট শেক্‌সপীয়রের সনেটের মতো; আবার কতকগুলি অনেকটা স্পেনসারের মতো। 'নৈবেদ্যে'র এবং 'চৈতালি'র সনেটগুলি ভাবগত ঐক্যে ও কেন্দ্রানুগতায় শ্রেষ্ঠতম সনেটের সমকক্ষ হইলেও *vers libre* বা মুক্তছন্দে রচিত চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির সমষ্টি। সনেটের আকৃতিগত বিশিষ্টতা উহার মধ্যে নাই; সনেটের প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা অবশ্য যথেষ্ট আছে।

সনেটের প্রকৃতি

প্রাচ্যদেশীয় কোনো কবিতা-রচনা-পদ্ধতির সঙ্গে সনেটের আকৃতিগত মিল নাই। সনেট সামগ্রীটা জোর করিয়া সংস্কৃত অলংকারের শাসনে আনিতে হইলে, অবশ্য, উহাকে গীতিকাব্যের কোঠায় ফেলা যাইতে পারে এবং কোষকাব্যের অন্তর্গত "অকারাদি হকারান্তাদ্যক্ষর" সূত্রানুযায়ী (অর্থাৎ বর্ণমালানুসারে সাজাইয়া) সনেট-সমষ্টিকে গ্রন্থবদ্ধ করিয়া "ব্রজ্যা" নামে অভিহিত করিলেও হয়। কিন্তু ওই পর্যন্ত। Strophe এবং Antistrophe বিশিষ্ট Greek Ode-এর সঙ্গে চিতেন্ পর-চিতেন্-ওয়ালা কবির গানের সুদূর সাদৃশ্য থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু Sonnetএর সঙ্গে সংস্কৃত 'যুগ্মক' প্রভৃতির কোনোখানে কোনো মিলই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। "জাপানি সনেট" তান্‌কার সঙ্গেও প্রকৃত ইতালীয় সনেটের কোনো মিল নাই; মালয় উপদ্বীপের "পান্তুমের" সঙ্গেও না। যদি কাহারো সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য থাকে, তবে সে ইরানের 'তর্জী বন্ধ্' 'মুসাম্মাৎ' এবং বিশেষ করিয়া 'মুরব্বা'র সঙ্গে আছে। মুরব্বা চারি শ্লোকের কবিতা, উহার প্রথম শ্লোকের প্রথম ও শেষ চরণে মিল থাকে এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকের শেষ চরণ প্রথম শ্লোকের শেষ চরণের সঙ্গে মেলে।

আকৃতিগত সাদৃশ্য তো নাইই, প্রাচ্যদেশীয় কোনো রচনারীতির সঙ্গে সনেটের প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও নাই। সাদৃশ্য আছে জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার সঙ্গে। তামাসা নহে, প্রকৃতই তাই। ইহার পূর্বাংশের অর্থাৎ অষ্টদলের প্রথম চারি চরণে ভাব-বস্তু নিবেদিত হয়; বাকী চারি চরণে উদাহৃত হয়। শেষাংশের অর্থাৎ ষট্-পদকের প্রথম ত্রিপঙ্‌ক্তিতে (tercet) ভাব-বস্তু সংলগ্নীকৃত হয়

এবং বাকী ত্রিপঙ্‌ক্তিতে উপসংহৃত হয়। জ্যামিতির আর বাকী কি? ইহাতে কবিতার একদিকে যেমন কোমলতার হানি হয়, অন্য দিকে উহা তেমনি মর্মর প্রতিমার মতো স্থির সৌন্দর্য লাভ করে। সনেটে বাক্যকে পল্লবিত করিবার উপায় নাই; বাচালতার অবসর নাই। যাহাদের ভাষা ভাবে কাটে, ধারে কাটে না, তাহারা কখনো ভালো সনেট লিখিতে পারে না। যাহারা ফেনাইতে ভালোবাসে, রস-সংযমে (reticence) অক্ষম, তাহারা সনেট লিখিলে তাহা কাঁচা থাকিয়া যায়। যাহাদের ওজনজ্ঞান প্রবল তাহারাই এই পাকা ছাঁচে ছাঁচ তুলিতে পারে। যে প্রকৃত গুণী সে বাঁশির সাতটা ছিদ্র দিয়া হৃদয়ের হাজার-দরজা খুলিয়া দিতে পারে; যে বাস্তবিক নিপুণ শিল্পী সে সনেটের এই কঠিন বন্ধনের ভিতরেই মুক্তির আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য হয়। সনেট সংগীত-বিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট নিয়মানুসারে পরিকল্পিত, সংগঠিত ও পরিবর্ধিত। উহা ক্ষুদ্র আয়তনে বৃহতের আভাস।

স্বর্গবন্ধ মহাকাব্যের এবং পঞ্চ-লক্ষণ সংযুক্ত দৃশ্যকাব্যের যেমন নিজস্ব নিয়ম আছে, সনেটেরও তেমনি বীজ হইতে বিকাশের স্বতন্ত্র নিজস্ব নিয়ম বর্তমান। সনেট মাত্রেরই বিশেষ একটি ভাব, কিংবা বিশেষ কোনো হৃদয়াবেগ অথবা কবিজনের মনঃপূত বিশেষ কোনো প্রাকৃতিক ব্যাপার বা লৌকিক কোনো ঘটনা অবলম্বন করিয়া অভিব্যক্ত হওয়া বিধি।

প্রথমেই অষ্টদল (octave) পদ্মের চারিটি দল খুলিয়া যাইবে ও ভাব-বস্তু উন্মেষিত হইবে; তার পর আর চারিটি পাপড়ি প্রস্ফুরিত হইয়া উহাকে সৌষ্ঠব-সম্পন্ন করিয়া তুলিবে। সর্বশেষে ষট্‌পদের মতো ষট্‌পদক (sestet) আসিয়া উহাতে সংলগ্ন হইবে এবং উহাকে সার্থক করিবে। ইহাই সনেটের বিকাশ-বিধি।

সংস্কৃত আলংকারিকেরা নাট্য-রচনা-পদ্ধতিকে গো-পুচ্ছের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; আরম্ভে ও অবসানে উহা সূক্ষ্মাগতিসূক্ষ্ম; মধ্যে স্থূল। আমার মনে হয় সনেট সম্বন্ধেও ওই উপমা ব্যবহার করিলে খুব বেশি দোষের হয় না।

সনেটের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এইখানে শেষ করিয়া

'সনেট পঞ্চাশতে' চৌধুরীমহাশয়ের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করা যাক।

নিজের মানসিক বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া, অথচ তালজ্ঞান ও ওজনজ্ঞান না হারাইয়া, নব নব সৌন্দর্যের প্রতিমা নির্মাণ করাই যথার্থ কাব্য-শিল্পীর কাজ। পঞ্চাশটি সনেটের নাতিবৃহৎ এই সংগ্রহগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় আমরা এই বিশিষ্টতা এই সৌন্দর্যানুভূতি ও ভাব-স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিয়াছি। পাকা হাতের এবং পরিণত মনের ছাপ ইহার ছত্রে ছত্রে।

কবিতাগুলি প্রথম হেমন্তের শান্ত সন্ধ্যার মতো "সুবর্ণে গৈরিকে" চিত্রিত। হেমন্তের হেম-সম্ভার ফলে ও ফসলে পলে পলে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিতেছে; কুবেরের ঐশ্বর্যের মতো পিণ্ডীভূত সূর্যতেজ, কৌৎস ঋষির কৌষেয় উত্তরীয়ের মতো সন্ধ্যার আকাশ রঙিন করিয়া তুলিতেছে। হেমন্তের হাওয়া উঠিয়াছে; ভরা ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে অজ্ঞাতসারে মন উদাস হইয়া আসিতেছে। পূরবী রাগিণীর সুরে সুর মিলাইয়া কবি বলিতেছেন—

"উদাসিনি! তব মন্ত্রে হয়েছি উদাস।"

পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মধ্যে অবগাহন করিয়াও কেমন যেন ক্ষুণ্নহৃদয়ে বলিতেছেন—

"তব প্রাণে ভালোবাসা রয়েছে ঘুমিয়ে
জাগাতে পারি নি আমি হাজার চুমিয়ে।"

তখনি আবার পথিকের কলরব কানে আসিতেছে, কাঁঠালি চাঁপার গন্ধ, পাপিয়ার গান— পৃথিবীর চিরনবীনতার কথা হাজার রকম করিয়া দিকে দিকে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছে, কবির মন আবার সুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে, তাই তিনি বলিতেছেন—

"কে বলে পৃথিবী এবে হয়েছে প্রাচীন?"
"আজিও প্রকৃতি আছে সবুজে শৌখিন;
নরনারী আজো ধরে পরস্পরে বক্ষে;—
অমানুষে পরে শুধু ডোর ও কৌপীন!"

আবার পরমুহূর্তেই বলিতেছেন—

"—অন্তরে মোর গভীর বিরাগ
হেমন্তের রাত্রি হেন থাকে গো জড়িয়ে।—
যাহার সর্বাঙ্গে যায় নীরবে ছড়িয়ে
কামিনী ফুলের শুভ্র অতনু পরাগ।"

এই রকম করিয়া কবি বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙের সুতার সঙ্গে অনুরাগের জরির সুতা মিলাইয়া সরস্বতীর অঙ্গে নূতন জড়োয়া চেলি জড়াইয়া দিয়াছেন।

সনেট-পঞ্চাশৎ পদে পদে আমাদিগকে চকিত-চমৎকৃত করে, আমাদের চিত্তবৃত্তিকে উদ্‌বোধিত করে, চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপিত— উত্তেজিত— এমন-কি, প্রকুপিত করিয়া তোলে বলিলেও ভুল বলা হয় না। অন্তঃকরণের মধ্যে জীবনের ও জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। এগুলিকে লইয়া খুশি হইতে পারা যায়, তর্ক করিতে পারা যায়, ঝগড়া করিতে পারা যায়, আর রসান্বেষী রসিক হইলে ইহার দ্বৈত ভাবের দ্বন্দ্বের মধ্যে জীবনের ছন্দ আবিষ্কার করিয়া আনন্দিত হইতে পারা যায়।

"কভু টানি, কভু ছাড়ি, মনের নিশ্বাস
পক্ষে পক্ষে ফিরে আসে সংশয় বিশ্বাস।"

এমন সহজ সত্য কথা এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া বলিতে অনেকদিন শোনা যায় নাই। ইহা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের অন্তরের কথা; সাধকের বা সাধুর মুখে ইহা শোভন না হইতে পারে; ধর্মসংহিতায় ইহার স্থান না থাকিতে পারে, তবুও ইহা প্রকৃত সাহিত্য, কারণ সাধারণ মানুষের মনের কথা লইয়া ইহার কারবার।

সম্প্রতি দেশে একটা ধুয়া উঠিয়াছে যে, বর্তমান যুগের বাংলা সাহিত্য টিঁকিবে না, তাহার কারণ, দেশের ধর্মে উহার ভিত্তি নাই। আমাদের দেশে পুরাতন ঘেঁটুর পাঁচালি এবং মাকাল-মঙ্গল যে আজও বাঁচিয়া আছে তাহা কেবল ধর্মের দোহাই দিয়া। ভারতচন্দ্র দেশের ধাতু বুঝিতেন তাই বিদ্যাসুন্দরের বুকে-পিঠে কালীনামের নামাবলী বাঁধিয়া দিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের মাথার ভিতর

এমন কোনো মতলব ছিল কিনা তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই, তা বাংলা ভাষার হঠাৎ-মুরুব্বিরা যাহাই বলুন। আর তেমন মতলব থাকিলেও বড়ো আসে-যায় না। কারণ ভারতচন্দ্রের রচনা যে লোকে এখনো পড়ে, সে কেবল তাঁহার ভাষার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া। ভারতচন্দ্র প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই এখনো টিঁকিয়া আছেন। নহিলে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী লইয়া আরো অনেকেই তো কাব্য লিখিয়াছিলেন, আর তাহাতে কালীনামের জোড়াতালিও তো যথেষ্ট ছিল, তবে সে-সব কাব্য স্থায়ী হইল না কেন? এমন-কি, রাম-প্রসাদের বিদ্যাসুন্দরও টিঁকিল না কেন? উত্তর সহজ— সাহিত্য হয় নাই বলিয়া। নূতন সৌন্দর্যসৃষ্টির পরিচয় ছিল না বলিয়া। কান্তার মতো মানুষের মন হরণ করিবে, তবেই না কাব্য; সেই মনই যখন বশ করিতে পারিল না, তখন বাঁচিবে কী করিয়া? কী লইয়া? কাহার জোরে?

বিশ্বাসও যেমন মনের ধর্ম সংশয়ও তেমনি; ইহার মধ্যে যে-কোনো একটিকে একঘরে করিয়া রাখা সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর। উহাতে আত্মার প্রকাশ সম্পূর্ণ হইতে পায় না।

"দু'মনা করাই" হয়তো সাধারণ মানুষের "দুর্গতির মূল" কিন্তু উহাই মানুষের মনের ধর্ম। অবস্থায় পড়িয়া আমরা কখনো নিতান্ত জড়বাদীর মতো বলি—

"নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন
আমার হৃদয় যাচে বাহুর বন্ধন।"

আবার পরমুহূর্তেই মুগ্ধচিত্তে বলিতে হয়—

"রূপের মাঝারে চাহি অরূপ দর্শন
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গ স্পর্শন।"

এই পরিবর্তনই মানুষের ধর্ম; এই পরিবর্তনে, এই ভাব হইতে ভাবান্তরে পর্যটনেই মানুষের চিত্তবিহঙ্গ ডানায় বল সঞ্চয় করে। গেটে যাহাকে Duration in change বলিয়াছেন, অর্থাৎ ভাবসন্ধির অন্তর্দশা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন অবশ্য সেটুকুরও অস্তিত্ব থাকা চাই; নহিলে সমস্তই খামখেয়ালি হইয়া উঠে,

পাগলামি হইয়া উঠে। মানুষের মতামত সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। গালিই দাও আর অভিশাপই দাও পরিবর্তনই মানব-মনের বিশেষত্ব; তাই একই মানুষ "নাস্তিকের শিরোমণি" হইয়া "আস্তিকের রাজা" হইতে পারে—

"তাঁর ধর্ম মনোরাজ্যে বহুরূপী সাজা।"

সনেট-পঞ্চাশতের কবি আমাদের এই বহুরূপী মূর্তিটি ধরিয়া দিয়াছেন, ভাষায় ভাব-জীবনের অপূর্ব ছবি ফুটাইযা তুলিয়াছেন; সেজন্য আমরা তাঁহার কাছে ঋণী।

আমরা বহুরূপী, কাজেই আমাদের সাহিত্য বহুরূপী, আমাদের দর্শন বহুরূপী, আমাদের শিল্প বহুরূপী। আমরা শূন্যপুরাণ লিখিয়াছি, আমরা মনসার ভাসান লিখিয়াছি, আমরা অন্নদামঙ্গল লিখিয়াছি। আবার আমরাই মেঘনাদ রচিয়াছি, পদাবলী রচিয়াছি, গীতাঞ্জলি গাহিয়াছি। আমবাই স্বভাবের নকল করিয়া কৃষ্ণনগরের পুতুল গড়ি, আবার আমরাই ভাবপ্রধান ভারতীয় চিত্রকলায় নব-জীবন সঞ্চারিত করি। আমরাই প্রখর বুদ্ধির খেলা দেখাইয়া নব্যন্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছি এবং তর্কবিলাসিতার চূড়ান্ত করিয়াছি, আবার আমরাই ভক্তিধর্মের প্রচারক শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে হরিধ্বনি করিয়া উন্মাদের মতো দেশে দেশে উদ্দাম নৃত্য করিয়া ফিরিয়াছি। আমরা যখন খ্রীস্টান হইয়াছি তখন একেবারে প্রোটেস্টাণ্ট হইয়াছি; সাক্ষী কৃষ্ণ বন্দ্যো, লালবিহারী, কালীচরণ প্রভৃতি। যখন মুসলমান হইয়াছি তখন একেবারে সুন্নি, সাক্ষী বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম। কিন্তু যতক্ষণ পুরাতন ধর্মে আছি, ততক্ষণ কেবল নিত্য-নূতন অবতারের স্বপ্ন দেখিতেছি।

এই বহুরূপীর নিজস্ব মূর্তি কোন্‌টি তাহা ভগবানই জানেন। ইহার শক্তি অনুসারে, শক্তির বৈচিত্র্য অনুসারে ইহার কর্মক্ষেত্র যে বহুবিস্তৃত হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। চৌধুরীমহাশয় এই বহুরূপীর বহুলরূপের পঞ্চাশখানা ফোটো তুলিয়া তাহার উপর পঞ্চাশটা সনেট না লিখুন, তবু তিনি যে আমাদের মানস-জীবনের বিচিত্র মূর্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তাহা ছাড়া ফোটো তোলা তো কবির কাজ নয়, উহা তো যন্ত্রের কাজ বা যন্ত্রবৎ

জড়-ভরতের কাজ। উহাতে মানুষের পরিচয় কোথায়? অন্তঃকরণের পরিচয় কোথায়? কবির কাজ হইল উদ্‌বোধিত করা। সৌন্দর্যসৃষ্টির দ্বারা অভিনবতার সমাবেশ দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে সজীব রাখা। কবি দৈত্যপুরীর সকল দিকের সকল কুঠারীর চাবিই খুলিয়া দিবেন। তাহাতে, যে খুশি হয় হোক, যে ভয় পায় পাক। কঙ্কাল সঞ্চিত আছে বলিয়া কোনো প্রকোষ্ঠ চিরকালের জন্য বন্ধ রাখা চলে না।

কথায় বলে "Criticism is a mode of autobiography": সমালোচক কবির সৃষ্ট সামগ্রী নিজের চোখ দিয়াই পরখ করেন; অন্য উপায় নাই। সুতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে আমি যে ভাবে সনেট-পঞ্চাশতের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করিলাম, তাহা কবির মতের সঙ্গে নাও মিলিতে পারে।

চৌধুরীমহাশয়ের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া বাহুল্য। যাঁহারা তাঁহার গদ্য-রচনা 'তেল-নুন-লকড়ি' প্রভৃতি পড়িয়াছেন তাঁহাদের কাছে সনেট-পঞ্চাশতের খাঁটি, অনাড়ম্বর স্বচ্ছ সরল ভাষার গুণ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। ভারতচন্দ্র যদি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় এমনি ভাষাতেই কাব্য লিখিতেন। ইহা অপেক্ষা বেশি কিছু বলিয়া সনেট-পঞ্চাশতের ভাষার বিশেষত্ব বুঝাইতে আমি অক্ষম।

সনেট-পঞ্চাশতে "জোর-করা" ভাব আর "ধার-করা" ভাষার নাম-গন্ধ নাই। স্থানে স্থানে হালকা ভাব আছে কিন্তু জোর-করা ভাব নাই; জায়গায় জায়গায় ভাষা হয়তো গদ্যের গা-ঘেঁষিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা নিজস্ব, মার্কা-মারা; ধার-করা নয়, এ দিকেও কবির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ।

বিখ্যাত সমালোচক ওয়ালটার পেটার যাহাকে "Gemlike flame" বলিয়াছেন চৌধুরীমহাশয়ের মধ্যে চিত্তপ্রসাধনের সেই চিরন্তন চিহ্ন সেই রত্নকল্প-স্থির-দীপ্তি বিদ্যমান। তাঁহার অধিকাংশ সনেট এই রত্নকল্প-স্থির-দীপ্তির আলোকে সমুজ্জ্বল।

ভারতী। শ্রাবণ ১৩২০ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৪

সনেট-পঞ্চাশৎ

আজ আমরা একজন নূতন কবির পরিচয় পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীর নাম বাংলা সাহিত্যে একেবারে অপরিচিত না হইলেও, তিনি যে প্রকৃত কবি, তাহা আজ আমরা তাঁহার এই অভিনব 'সনেট-পঞ্চাশৎ' পুস্তিকা পাঠে জানিলাম। প্রকৃত কাব্যানুরাগীর পক্ষে আর-একটি আনন্দের বিষয় এই যে, প্রমথবাবুর কবি-প্রতিভা যে শ্রেণীরই হউক-না কেন, তাঁহার এই প্রথম পুস্তকেই তিনি নিজের বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য বা মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। ইহার কণ্ঠ নূতন, ভঙ্গিও নূতন। পূর্বপরিচিত কোনো কবির কণ্ঠ ও ভঙ্গির প্রতিধ্বনি বা ছায়া তাঁহার কবিতার মধ্যে দেখিলাম না। সাহিত্যে এই স্বাতন্ত্র্য অমূল্য বৈচিত্র্যের কারণ এবং ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্যাভিব্যক্তির মূল। প্রকৃত কবির স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা থাকিবেই। তাঁহার শক্তি যেরূপই হউক-না কেন, তাঁহার নিজের বলিবার কথাও আছে, বলিবার ভঙ্গিও আছে। ইহা অনিবার্য। এই অনন্যসাধারণতাতেই তাঁহার মর্যাদা—এমন-কি, তাঁহার অমরত্ব। তুমি তাঁহার কবিতায় যে রস—যে মাধুর্য বা সৌন্দর্য অনুভব করিবে, অপর কোনো কবির কাব্যে ঠিক তাহা পাইবে না। এবং সে রস মনে পড়িলেই সেই কবিকেও মনে পড়িবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি বুঝাইতে হইলে ইংরেজি সাহিত্য হইতে প্রভূত উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, "আমরা বড়লোক" হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরেজি সাহিত্যে যেরূপ পুঞ্জ পুঞ্জ প্রকৃত কবি আছে, সংস্কৃত বা আধুনিক ভারতীয় কোনো সাহিত্যে তেমন নাই। ইংরেজি কবিদিগের মধ্যে Matthew Priorকে কেহ কোনোদিন প্রথম শ্রেণীর কবি বলে নাই। কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব সকলেই স্বীকার করিয়াছে। তাঁহার কবিতার মধ্যে এমন একটি অনন্যসাধারণ অমায়িক সরল হাস্য-পরিহাসের মধুর বিকাশ আছে, যাহা Prior-এর অপেক্ষা উচ্চ বা নিম্নশ্রেণীর

কোনো কবির রচনায় দেখিতে পাইবে না। ভাষা এবং ভাবে কোনো অভাবও উপলক্ষিত হইবে না। পাঠে তোমার রসানুভববৃত্তি চরিতার্থ হইবে। এবং যখনি সেই রসের কথা মনে পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে Priorকেও মনে পড়িবে। ছোটো কবি হইলেও Prior-এর নিজের মর্যাদা আছে। Prior অমর। আমার বিবেচনায় আমাদের সমালোচ্য কবি প্রমথ চৌধুরীরও নিজের মর্যাদা আছে, এবং এই প্রবন্ধে সেই মর্যাদা যে কী, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রমথবাবু তাঁহার কবি-কল্পনা ও চিন্তা সনেট আকারে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং "স্বদেশী"-র ভয় না রাখিয়া পুস্তকের নাম "সনেট পঞ্চাশৎ" দিয়াছেন। এই কবির একটি বিশেষ ও প্রধান গুণ স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা। গ্রন্থের নামকরণেই তাহার পরিচয়। সনেট জিনিসটাই যখন বিদেশী, তখন তাহার বিদেশী নাম বাংলায় চালাইলে ক্ষতি কি ?

ইউরোপীয় সাহিত্যে সনেট কবির ভাবপ্রকাশের একটি সুপরিচিত এবং বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত প্রণালী। সম্ভবত ইতালি ইহার জন্মস্থান। অন্তত ইতালীয় কবিদিগের হস্তেই সনেট যে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকল সাহিত্যেই ভাবপ্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে ঢালা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে। ইউরোপীয় সাহিত্য সনেট ছাড়া Ode, Ballad প্রভৃতি; পারসীক সাহিত্যে "রুবাই", "গজল" ইত্যাদি। কেহ যেন মনে না করেন, এই গঠন-প্রণালীর ভিত্তি রচয়িতার খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাব-প্রকাশের কোনো প্রণালী যখন বিশেষ একটি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, সেই আকার তৎসঙ্গে বিশেষ উপযোগী। সনেটের ইতিহাস পাঠে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইহার আয়তন, আকার ও মিলনপদ্ধতি শ্রেণীবিশেষের ভাবপ্রকাশে বিশেষ উপযোগী বলিয়াই সাহিত্যে ইহার প্রতিষ্ঠা।

এখন দেখা যাক, কোন্ শ্রেণীর ভাবপ্রকাশে সনেটের পটুতা। আধুনিক ইংরাজি সাহিত্যে প্রসিদ্ধ কবি Dante Gabriel Rossetti সনেট-রচনায় সিদ্ধহস্ত, এমন-কি, কোনো হিসাবে তাঁহার সমকক্ষ নাই। তিনি সনেট সম্বন্ধে যে অতুলনীয় সনেট রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সনেটের ভাবগত প্রকৃতি,

তাহার প্রাণ যে কী— তাহা বিশদ ও মনোজ্ঞ ভাষায় বুঝাইয়াছেন। সেই সুন্দর কবিতাটি একাধারে সনেটের বিজ্ঞান ও আদর্শ। অপূর্ব প্রতিভাবলে অনুপম ভাব ও ভাষার মন্ত্রশক্তিতে, কবি যেন সনেটের অধিষ্ঠাত্রী বাণীকে তাঁহার রচিত এই কবিতাটির ছন্দোময় মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পাঠককে আমরা এই সুন্দর কবিতাটির পরিচয় লইতে অনুরোধ করি—

A Sonnet is a moment's monument
Memorial from the soul's eternity
To one deathless hour.

যখন কোনো মুহূর্তে প্রবল ভাবের আবেশে সমাচ্ছন্ন কবিহৃদয় সৌন্দর্যের দৈব আবির্ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে, সনেট ভাষায় ও ছন্দে সেই দুর্লভ মুহূর্তের চিত্র। ইহা হইতে বুঝা যায়, সনেটের রচনার মূলে প্রবল ভাবের প্রণোদনা চাই। সেই ভাব যেন আবার বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত বিস্তারিত হইয়া তাহার ঘনীভূত আবেশ না হারায়। কোনো কোনো সনেট আবার গভীর চিন্তাশক্তি-প্রসূত— Shakespeare যাহাকে "deep-brained" সনেট বলিয়াছেন। সুতরাং ভাব ও রসের একাগ্রতা ও সমগ্রতাই সনেটের জীবন। তৎপক্ষে ভাষা ও ছন্দের যুগপৎ সংযম ও স্ফূর্তি আবশ্যক। বাহুল্যহীন পরিমিত কথায় ভাবকে পরিপূর্ণ, পরিণত অবয়ব দিবার জন্য, ভাষার প্রকাশ-শক্তির উপর নিরবচ্ছিন্ন জোর-জবরদস্তি হুকুম তামিল করিতে হইবে, অথচ ভাষা-শিল্পের সূক্ষ্মতম সৌন্দর্যবিকাশেও দৃষ্টি থাকিবে। ইহাতে গীতিকবিতার উন্মাদনা থাকিবে, অথচ মিত্রাক্ষর প্রাচুর্য জন্য যে ঝংকারবাহুল্য ও আড়ম্বর গীতিকবিতার গৌরব, তাহা হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। একদিকে দেখিতে হইবে, ইহা যেন চতুষ্পদী, ষট্‌পদী, বা অষ্টপদীর ন্যায় চুট্‌কি ভাষার বলে নিতান্ত স্বল্পায়তন হইয়া না পড়ে— অপর দিকে গীতিকবিতার ভাবপ্রবাহের উচ্ছ্বাসে অনির্ধারিত সীমায় বিস্তারিত না হয়। খুব সম্ভব, কলাপ্রবীণ ইতালীয় ও অপর দেশীয় কবিরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, পূর্ণরসাভিব্যক্তির পক্ষে চতুর্দশ-পদই সমীচীন, এবং তাহাই সাহিত্য-সংসারে চলিয়া আসিয়াছে।

এ দিকে আবার এই চতুর্দশপদ আদৌ, অন্তত ইতালীয় সনেটে, দুই পৃথক ভাগে বিভক্ত— প্রথম, আট পদ—octave— অষ্টক; অবশিষ্ট ছয় পদ—sestet— ষষ্ঠক। এই বিভাগও রচয়িতার খেয়াল-প্রসূত নহে। জীবিত ইংরেজ সমালোচকদিগের অগ্রগণ্য, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ সনেট-রচয়িতা Walts-Duntan এই সনেট-বিভাগের নিগূঢ় রহস্যের উদ্‌ভাবন করিয়াছেন। ইনি বলেন— সমুদ্রতরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতন যেমন তাললয়ব্যবচ্ছিন্ন, সনেটের ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতনও সেইরূপ তাললয়ব্যবচ্ছিন্ন। ফেনিলোচ্ছল সাগর-তরঙ্গ যেমন ক্রমশ স্ফীত ও বর্ধিতকায় হইয়া বেলাভূমির উপর উৎপতিত হয়, এবং নিমেষমাত্র স্থির থাকিয়া আবার উজান-বেগে সাগরগর্ভে অপসারিত হয়, সেইরূপ ভাবের তরঙ্গ ছন্দোময়ী শব্দধারায় অষ্টকে উচ্ছলিত হইয়া বিপরীত আবর্তনে ষষ্ঠকে অবসানপ্রাপ্ত হয়। যে সুন্দর সনেটে কবি, দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল এবং চন্দ্রালোকের ন্যায় মধুর ভাষায়, এই কথাটি বুঝাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাঠক যে কেবল উল্লিখিত সনেট-বিভাগের বিজ্ঞান বুঝিতে পারিবেন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যজগতের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা-পাঠের আনন্দ উপভোগ করিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই চতুর্দশ পদমাত্রাত্মক রচনায় গীতিকবিতার শব্দ-বাহুল্য ও ঝংকার-প্রাচুর্য পরিহর্তব্য— তাহাতে ভাব ও ভাষায় শিথিলতা আসিতে পারে। সংকীর্ণ প্রণালীর মধ্যে রুদ্ধ স্রোতস্বিনীর ন্যায় ভাবপ্রবাহ যাহাতে গভীর ও প্রখর-গতি হয়, তজ্জন্য ইহার আয়তন চৌদ্দটি মাত্র পদে পরিমিত। ইহার মিত্রাক্ষর বিধানও— সংখ্যায় ও স্থাপনায়— সেইরূপ দৃঢ় নিয়মে আবদ্ধ। অষ্টকের আটটি পদে দুইটি মাত্র বিভিন্ন স্বরাত্মক মিল নিম্নলিখিতরূপে বিন্যস্ত হইবে— প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টক পদের মিল একস্বরাত্মক। দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পদের মিল আর-একস্বরাত্মক। যথা: ক-খ-খ-ক-ক খ-খ-ক।

ষষ্ঠকে মিলের একটু স্বাধীনতা আছে।— তিনটি বিভিন্ন স্বরাত্মক মিলও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাই হইতেছে আদিম ইতালীয় সনেটের নিয়ম, এবং

আধুনিক কালের অধিকাংশ ইংরেজি সনেট-লেখকেরা এই নিয়মেই লিখিয়া থাকেন। কিন্তু Shakespeare-এর সময় এবং তাঁহার অব্যবহিত পূর্বে যখন ইতালীয় সাহিত্য হইতে ইংরেজি সাহিত্যে সনেট প্রথম আনীত হয়, তখন Wyatt, Surrey এবং Spenser প্রভৃতি কবিগণ কী আকারে ইংরেজি ভাষায় ইহা বেশ খাপ খাইতে পারে, তৎবিষয়ে নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের হাতে এবং পরবর্তীকালে Shakespeare প্রমুখ কবিদিগের হাতে সনেট যে আকৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহাই সাহিত্যে শেক্‌সপীরীয় সনেট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা পেত্রার্কীয় সনেটের ন্যায় বাঁধাবাঁধি নিয়মে অষ্টক এবং ষষ্ঠকে বিভক্ত নয়— যদিও অষ্টম চরণে প্রায়ই ভাবের বিরাম দেখা যায়। ইহার প্রথম দ্বাদশ চরণে তিনটি চতুষ্পদী গঠিত। উহাদের মিল বা মিত্রাক্ষর সংস্থান একছত্রান্তর পর্যায়ে বিন্যস্ত, এবং প্রত্যেক চতুষ্পদীতে দুইটি বিভিন্ন স্বরাত্মক মিল থাকে— শেষ দুটি চরণ মিত্রাক্ষর পয়ার, এবং শেষ দুই চরণেই শেক্‌সপীরীয় সনেটের বিশেষত্ব। হয় এ দুটি পদে পূর্বগত তিনটি চতুষ্পদীর সমুদয় ভাব ও রস সমষ্টি আকারে চরম মাত্রা লাভ করিবে— নাহয় বিপরীত ভাবের সমাবেশ-সংঘর্ষণে পদ দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে।

Milton শেক্‌সপীরীয় সনেটের মিত্রাক্ষর-সংস্থাপন-বিধির পরিবর্তে পেত্রার্কার বিধির পুনঃপ্রচলন এবং অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পেত্রার্কার অষ্টক ও ষষ্ঠক বিধান রক্ষা করেন নাই। কোনো কোনো সমালোচকের মতে Milton এ বিষয়ে পেত্রার্কীয় পদ্ধতির অর্থ ও উদ্দেশ্য আদৌ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তাহা অবলম্বন করেন নাই, এবং তজ্জন্য তাঁহার সনেটগুলিও চরমোৎকর্ষ লাভ করে নাই।

সনেট সম্বন্ধে আরো অবশ্যজ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে। তাহাদের উল্লেখ বা আলোচনা এ প্রবন্ধে অনাবশ্যক। যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রমথবাবুর পুস্তকের সমালোচনার প্রয়োজনীয় উপক্রমণিকা স্বরূপ।

এখন আর-একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া উপক্রমণিকার শেষ করিব। আমরা দেখাইয়াছি, সনেট-রচনা কঠিন নিয়মে আবদ্ধ। অনেকেই বলিতে

পারেন যে, এমন একটি ক্ষুদ্র রচনায় এত কঠোর নিয়ম কেন? তাঁহারা বিস্মিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করেন, যখন ভাব লইয়াই আমাদের কার্য, তখন ভাব প্রকাশে পারিভাষিক কোনো নিয়মের ব্যতিক্রমে কী আসিয়া যায়? যখন কবিতা-পাঠে কবির ভাব স্পষ্ট জানা গেল, তখন ভাষা বা ভঙ্গিতে, ছন্দ বা মিত্রাক্ষর বিন্যাসে, আকার বা আয়তনে যদি কোনো ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়, "তাহা ধর্তব্য নহে"। তাঁহারা বুঝেন না যে, সাহিত্যে— এবং কেবলমাত্র সাহিত্যেই বা কেন?— ললিত-কলার সমস্ত বিভাগেই ভাব ও ভাবপ্রকাশের উপকরণ দুটি পৃথক বা পরস্পর স্বাধীন বস্তু নয়, পরন্তু এক— অন্তত একাঙ্গ। চিত্রকলায় দেখ-না— বর্ণ-বিকাশ, রেখাপাত, বস্তু-সংস্থান প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে চিত্রকরের প্রধান উপকরণ— এবং যে পরিমাণে এই উপকরণে দোষ বা অভাব থাকিবে, সেই পরিমাণেই ভাবেও দোষ ও অভাব পরিলক্ষিত হইবে। ভাষা ও ভঙ্গি ছাড়িয়া ভাবের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। ভাব ও ভঙ্গি, বাক্য ও অর্থ, হর-পার্বতী মূর্তির ন্যায় পরস্পর "সম্পৃক্ত"।

সাহিত্য-কলায় আবার গঠনের স্থান (যাহাকে ইংরেজিতে Form বলে) মৌলিক। গঠন ভিন্ন ভাবগৌরব প্রকাশিত হয় না। ইহা বাহির হইতে আমদানি করা পদার্থ নয়, ভাবের নিজেরই অঙ্গ। গঠনের অভাবে কত কবিতা ও কাব্য সাহিত্যে স্থান পায় নাই। উচ্চশ্রেণীর কবিদিগের রচনায় কিন্তু গঠন ও উপকরণের উৎকর্ষ জাজ্বল্যমান। তাহাদের ভাব ও ভঙ্গি, কল্পনা ও গঠন-রচনা এক সূত্রে গ্রথিত, এবং সমান উৎকর্ষ-প্রাপ্ত। নিয়মের কাঠিন্য নিপুণ শিল্পীর পক্ষে বন্ধন বা বিঘ্ন নয়, বরং উৎকর্ষ-প্রকাশের সহায়। সমালোচ্য পুস্তকে প্রমথবাবু নিজেই লিখিয়াছেন—

"ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।"

যেখানে প্রতিভার বল ও তেজ আছে, নিয়মের শৃঙ্খল যতই তাহাকে বাঁধিতে যাইবে, ততই তাহার বল ও তেজ স্ফূর্তি পাইবে। চালন-নিপুণ উপযুক্ত আরোহী বিক্রমশালী দুর্দমনীয় অশ্বই চায়।

সনেট-রচনায় সিদ্ধহস্ত বিখ্যাত ফরাসী কবি Soulare সনেট সম্বন্ধে যে একটি অপূর্ব সনেট লিখিয়াছেন, তাহাতে সনেটের স্বরূপ ও কঠিন বিধিবাহুল্য সত্ত্বেও, সনেটের ভাবপ্রকাশপটুতা কবিসুলভ-কল্পনা-কৌশলে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। ফরাসি-অনভিজ্ঞ পাঠকদিগের জন্য আমাকে তাহার একটি নিতান্ত অনুপযুক্ত অনুবাদ করিয়া দিবার ধৃষ্টতা স্বীকার করিতে হইল—

"ঢুকিবে না কায়া বলে মুগ্ধা হাসি-মুখ
ছিঁড়িবে যে ছোট জামা দেহপরিসর
বাঁকাইয়া কটিতট— ফুলাইয়া বুক,
বাড়াইল প্রতিকূল পথে রম্য কর।
ধীর আমি, ভালবাসি এ মিষ্ট সংগ্রাম—
হ্রস্ববাসে সাজাইনু দেহযষ্টি তার
কোথাও বাঁধন দিয়া— কোথাও বিরাম—
শির-স্কন্ধ-বক্ষ পরে ক'রে দিনু পার।
উদ্ভিন্ন দেখ বাসে— কলার কৌশলে
উচ্ছল দেহলতা— প্রতি অঙ্গ-রেখা
হাসিছে লক্ষ্মীটি বাহু সামান্য সম্বলে,
ঠিক বসিয়াছে বাস! শোভা তাহে লেখা।
হৃদয়ে অভাব নাই— বাহুল্য শরীরে,
এমনি নারীরে চাই, এমনি বাণীরে।"

বাংলা ভাষায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্বপ্রথমে সনেট রচনা করেন, এবং তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-স্বরূপে যে উপক্রম লিখিয়াছেন তাহাতে পেত্রার্কার যশোগান গাহিয়াছেন। প্রমথবাবুও তাঁহার পুস্তকের মুখবন্ধে পেত্রার্কাকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পেত্রার্কার আদর্শে সনেট রচনা করিবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন।—

"পেত্রার্কা-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্যে সনেটে সাকার।

একমাত্র তাঁরে গুরু, করেছি স্বীকার
গুরু শিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ।"

সুতরাং তাঁহার রচিত সনেটগুলি আদর্শের অনুরূপ হইয়াছে কি না, ইহার পরীক্ষা লইবার অধিকার তিনি তাঁহার পাঠকবর্গকে নিজেই দিয়াছেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি ও রচনা-শিল্পের বহুবিধ উচ্চতর গুণে মুগ্ধ হইলেও আমাকে বলিতে হইবে যে, এক বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরুর শাসন আদৌ মানিয়া চলেন নাই। তাঁহার অনেকগুলি সনেটে পেত্রার্কার অষ্টক ও ষষ্ঠক বিভাগ রক্ষিত হয় নাই। একাধিক সনেটের দশম চরণে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার ভাবতরঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বিরাম লাভ করিয়াছে। প্রায়ই তাঁহার প্রত্যেক সনেটে নবম ও দশম চরণ একটি সম্পূর্ণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকার-প্রাপ্ত, এবং অনেক স্থলে শেক্‌সপীরীয় সনেটের অন্তিম পয়ারেরই অনুরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পত্রলেখা' নামক অপরপক্ষে সুন্দর সনেটটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও কোনো কোনো ফরাসি কবির রচিত সনেটে নবম দশম চরণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকারপ্রাপ্ত, কিন্তু দশম চরণে ভাবের ছেদ কোথাও দেখি নাই। ইহার তুল্য বা ইহার অপেক্ষা আরো গুরুতর বিশৃঙ্খলা আমরা Milton-রচিত একটি ইংরেজি সনেটে দেখিতে পাই। 'Nightingale' নামক সুন্দর সনেটে Milton সপ্তম চরণের মধ্যাংশেই ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও যতি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু Milton অপরাপর বিষয়ে পেত্রার্কার অনুযাত্রী হইলেও, যে কারণেই হউক, সনেটের ভাবপ্রবাহের বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার রচিত অপর সকল সনেটেই আমরা দেখিতে পাই, ভাবস্রোত কোনো স্থানে বিভক্ত না হইয়া নিরবচ্ছিন্ন গতিতে পূর্ণ গোলকের আকার ও পরিণতি লাভ করিয়াছে।

Verlaine নামক একজন আধুনিক প্রসিদ্ধ ফরাসি কবি অনিয়ন্ত্রিততার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচিত দু-একটি সনেটে ষষ্ঠকাষ্টক বিভাগ একেবারে বিপরীত। ষষ্ঠক আরম্ভে— অষ্টক শেষে।

প্রমথবাবুর এই "পত্রলেখা" সনেটে আরো গুরুতর দোষ দেখা যায়। ইহার

অষ্টকের শেষ চরণে ভাবের বৈধ বিরাম হইলেও, নবম চরণে নবপ্রবর্তিত ভাবতরঙ্গ সনেটের অবশিষ্ট অংশে ব্যাপ্ত না হইয়া দশম চরণেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া শেষ হইয়াছে। একাদশ চরণে আবার ভাবের নূতন আবর্তন। ইহাতে ভাবস্রোত ত্রিধাবিভক্ত হইয়া প্রখরতা ও গভীরতা হারাইয়াছে। সনেটটিও তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া না মিলটনীয় সনেটের পূর্ণ নিটোল গোলকত্ব লাভ করিয়াছে— না পেত্রার্কীয় সনেটের তাললয়ব্যবচ্ছিন্ন উত্থান-পতনের বিচিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া মিত্রাক্ষর-বিন্যাসে কতকগুলি দোষ দেখা যায়। কোনো কোনো সনেটে একই কথা একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন চরণের অন্তে স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও শব্দের মিল, সমধ্বনি দুটি ভিন্ন শব্দের সহিত নিষ্পন্ন না হইয়া, সেই শব্দেরই পুনরুক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ দোষ সর্বদা সর্বত্র পরিহর্তব্য— বিশেষত সনেটে। "রজনীগন্ধা" নামক সনেটে রজনীগন্ধা কথার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি সনেটের ভাব ও রচনা-গৌরবের উপযুক্ত নয়— গীতি-কবিতাতেই ইহা শোভা পায়। বস্তুত না ভাবের সমাবেশে, না গঠন-ভঙ্গিতে, এই কবিতাটিকে সনেট বলা যাইতে পারে।

এখানে একটি কথা উঠিতে পারে— কবিতার উৎকর্ষই সর্বাগ্রে দ্রষ্টব্য, নিয়ম-পরতন্ত্রতা পরে। রচনার নিয়ম তো আর আগে হইতে উদ্ভূত হয় না। কবিতা-বিশেষের সুন্দর গঠন-প্রণালী, ও শিল্পসৌষ্ঠবের আলোচনা হইতেই রচনার নিয়মাবলী নিরূপিত ও নির্দিষ্ট হয়। এবং নির্দিষ্ট কোনো একটি নিয়মের ব্যতিক্রম সত্ত্বেও যদি কোনো কবিতা সর্বাঙ্গসুন্দর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমরা সে নিয়মের মর্যাদা রাখিতে বাধ্য নই। বরং সে নিয়মের ব্যতিক্রমই নূতন নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। প্রমথবাবুর কিন্তু এ কথা বলিবার অধিকার নাই। কারণ, তিনি গোড়া হইতেই পেত্রার্কার আদর্শ ও নিয়মের অনুসরণ করিবার প্রকাশ্য সংকল্পে সনেট লিখিতে বসিয়াছেন। এবং যেখানেই তিনি তাঁহার আদর্শ ও নিয়ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন— সেইখানেই তাঁহার সংকল্প নষ্ট হইয়াছে, এবং রচনায়ও নানা দোষ দেখা দিয়াছে।

এইখানেই সমালোচ্য পুস্তকের ত্রুটির তালিকা শেষ হইল। এখন আমরা পাঠকের সহিত প্রমথবাবুর কবিতা-পাঠের আনন্দ উপভোগ করিব।

প্রবন্ধের গোড়াতেই আমরা প্রমথবাবুর স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াছি। প্রধানত এই বিশেষত্ব তাঁহার মানসিক দৃষ্টিতে। তিনি যে-কোনো বিষয়ের আলোচনা করেন, তাহার বর্ণনায় বা রহস্য উদ্‌ভাবনে যতই কেন চিন্তার গভীরতা বা প্রগাঢ়তা থাক্, তাহার ভিতর হাসির একটু আভাস, পরিহাসের একটু জ্বালা দেখা যায়।— তিনি জীবনের কোনো বিষয়কেই এত বড়ো মনে করেন না— এত প্রাধান্য দেন না যে, তাহার খাতিরে জীবনের অপর সকল বিষয়কে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। সমাজ-সংসার, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, সকলই জীবনের অংশ মাত্র, কোনোটাই সমগ্র জীবন নয়। একের জন্য অপর কোনোটিকে তুমি উড়াইয়া দিতে পার না। তুমি যাহাকে এত বড়ো করিয়া দেখিতেছ, তাহার ভিতরে ক্ষুদ্রত্বের উপাদান আছে। তাই তাঁহার অনেক সনেটেই তিনি গুরু বিষয় সকলকে লঘুভাবে এবং লঘু বিষয় সকলকে গুরুভাবে দেখিয়াছেন, এবং তাঁহার লেখনীর স্পর্শ এমনই লঘু— তাঁহার ভাব ও ভাষার এমন একটি স্পর্শাতীত অনির্দেশ-ভঙ্গি আছে যে, তুমি ঠিক বুঝিতে পারিবে না কোন্ কথাটি তিনি প্রশংসাকল্পে এবং কোন্ কথাটিই-বা অপ্রশংসাকল্পে বলিতেছেন। বিখ্যাত সমসাময়িক ফরাসি লেখক Anatole France-এর মনের প্রকৃতি অনেকটা এই ধরনের।

এই ভাব ও মনোভঙ্গির উপযুক্ত সহায় তদুপযোগিনী ভাষা! প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা প্রমথবাবুর স্বাধীনতা এবং নির্ভীকতার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছি। উপরের কথিত মনোদৃষ্টি ইহার স্পষ্ট এবং যথেষ্ট প্রমাণ। সমাজ ও ধর্মমন্দিরে "আপনি-মোড়ল" প্রহরীদিগের ভয় তাঁহার হৃদয়ে কিছুমাত্র থাকিলেও তিনি তাহাদের অন্তত মুখে স্বীকৃত, অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিষয় সকল সম্বন্ধে তীব্র বিদ্রূপের সহিত লঘুভাবে লিখিতে সাহস করিতেন না। এবং সাহিত্যের ওই শ্রেণীরই অনুরূপ রথীদিগের "দরকারী ভাব আর সরকারী ভাষা"র উপর তাঁহার সামান্যমাত্র শ্রদ্ধা থাকিলে, তাঁহার অভিধান ও শব্দভাণ্ডার এত

উদার ও বিস্তৃত হইত না। তিনি কোনো শ্রেণীর শব্দকেই নির্বাসিত করেন নাই। অভঙ্গকুলীন "সাধু" শব্দের সঙ্গে তিনি জাতিহীন "ইতর" শব্দকেও এক পঙ্‌ক্তিতে বসাইয়াছেন। তাহাতে যে ভাষার শক্তি বাড়িয়াছে, কে তাহা অস্বীকার করিবে ?— ভাষার জীবন শব্দে। যখন দেখিবে, শব্দ-সংখ্যায় গণ্ডি পড়িয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে, ভাষার জীবনীশক্তিরও হ্রাস হইতেছে।

কবির যে মনোধর্মের কথা আমি উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা তাঁহার "বিশ্বরূপ", "বিশ্বকোষ", "বিশ্বব্যাকরণ" ও "আত্মপ্রকাশ" নামক কয়েকটি সনেটে বেশ সুপ্রকাশ। বিশ্বরহস্য লইয়া এক শ্রেণীর লোক এত উন্মত্ত যে, তাহারা জীবনকে জীবন বলিয়া উপভোগ করিতে পারে না— তাহারা অনুক্ষণ তর্কবিতর্কে মত্ত। কবি কিন্তু বিজ্ঞের ন্যায় কল্পনা-সুখে তাঁহার গুম্ফপ্রান্তে লঘু আকর্ষণ দিয়া ঈষৎ হাস্য-রঞ্জিত-অপাঙ্গে বলিতেছেন—

"বিশ্বসনে দিনরাত শুধু বোঝাপড়া,
সে তো নয় ঘর করা, করা সে ঝগড়া!"

"তার চেয়ে" এসো এই বিপুল বিশ্বে ছড়ানো প্রক্ষিপ্ত সকল টানিয়া লইয়া,

"প্রতীক রচনা করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত—
চতুর্দশ পদে বদ্ধ চতুর্দশ লোক!"

কিন্তু মানব-প্রকৃতি এমন নয় যে, গোলকধাঁধার ভিতর মানুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে। "অন্বেষণ" নামক সুন্দর সনেটে কবি বলিতেছেন—

"আজিও জানি নে আমি হেথায় কী চাই!
কখনো রূপেতে খুঁজি নয়ন-উৎসব,
পিপাসা মিটাতে চাই ফুলের আসব,
কভু বসি যোগাসনে, অঙ্গে মেখে ছাই॥

কখনো বিজ্ঞানে করি প্রকৃতি যাচাই,
খুঁজি তারে যার গর্ভে জগৎ প্রসব,

পূজা করি নির্বিচারে শিব কি কেশব—
আজিও জানি নে আমি তাহে কিবা পাই ॥

রূপের মাঝারে চাহি অরূপ দর্শন।
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গ স্পর্শন ॥

খোঁজা জানি নষ্ট করা সময় বৃথায়,
দূর তবে কাছে আসে, কাছে যবে দূর।
বিশ্রাম পায় না মন পরের কথায়,
অবিশ্রান্ত খুঁজি তাই অনাহত সুর ॥"

নবম দশম চরণে সহজ অথচ অর্থপূর্ণ স্বল্প কথায় ভাব প্রকাশে কবির অসামান্য ক্ষমতা পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন। "অনাহত-সুর" Keats-এর "Unheard melodies" অপেক্ষা সুন্দর।

নিম্নে উদ্ধৃত "শিব" নামক সনেটে দেখিবেন, কবির "অন্বেষণ" ব্যর্থ হয় নাই।

"রজতগিরিতে হেরি তব শুভ্রকায়া,
চন্দ্র তব ললাটের চারু আভরণ,
তব কণ্ঠে ঘনীভূত সিন্দুর বরণ—
বিশ্বরূপ জানি আমি তব দৃশ্য মায়া ॥

যার স্ফূর্তি চরাচর, সে তো তব জায়া।
নিজদেহে করিয়াছ বিশ্ব আহরণ—
তাই হেরি কৃত্তি তব চিত্র-আবরণ—
জীবনের আলোশ্লিষ্ট মরণের ছায়া!

তোমার দর্শন পাই মূর্তিমান মন্ত্রে,
যজ্ঞসূত্রে বাঁধা যাহা হৃদয়ের তন্ত্রে ॥

সেই রূপ রেখো দেব ভরিয়া নয়নে—
শিবমূর্তি হেরি বিশ্বে, দেহো এ ক্ষমতা।
ধরিতে পারি না আমি নেত্রে কিম্বা মনে,
আকারবিহীন কোনো বিশ্বের দেবতা ॥"

যে দেশের শাস্ত্র-শিক্ষা হইতেছে—

"যেনো পায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয় সমস্মুতে।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞে রিদং ধর্ম্মং সনাতনম্।"

সে দেশের কবি যে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-বিশাল বিরাট শিবমূর্তি দেখিবেন, তাহা আশ্চর্য নয়— না দেখাই আশ্চর্য।

"মুশকিল-আসান" সনেটে কবি দেখাইয়াছেন, শিব দর্শন সার্থক হইয়াছে—

"আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ,
কানেতে না পশে মোর দুনিয়ার হাল্লা।
হৃদয়-ফকির জপে 'লা-আল্লা-ইলাল্লা',
আকাশেতে শুনি বাণী 'মুশকিল-আসান'!"

কিন্তু লগ্ন হারাইলে ভক্তিও জন্মিবে না, এবং দেবদর্শনের ফল লাভও হইবে না।

"কত দিন কত দেশে কত শত ভোরে,
অসংখ্য ফুলেতে ভরা কত ফুলবনে,
ফিরেছি অলসভাবে, একা, আনমনে—
তুলি নি পূজার লাগি কিন্তু সাজি ভরে ॥

কত দিন কত দেশে সারানিশি ধরে,
থেকেছি বসিয়া আমি মন্দিরের কোণে,
স্নিগ্ধদৃষ্টি কত শত দেবতার সনে—
করি নি প্রণাম কিন্তু জুড়ি দুই করে ॥

আগে শুধু করে গেছি এই-সব ভুল।
এখন দেবতা কোথা, কোথা সেই ফুল!"

নিম্নলিখিত সনেট মানব-জীবনের একটি পরিচিত নিষ্ঠুর বিড়ম্বনার মর্মস্পর্শী করুণ চিত্র—

"প্রতিমা গড়েছি আমি প্রাণপণ ক'রে।
আঁধারে আবৃত কত খুঁজে গুপ্ত খনি,
এনেছি তারার মতো জ্যোতির্ময় মণি—
রত্ন দিয়ে দেবীমূর্তি গড়িবার তরে।
স্ফটিকে গড়েছি অঙ্গ নিশিদিন ধরে,
পরায়েছি শ্যামশাটী মরকতে বুনি,
রক্তবিন্দু-পারা দুটি সুলোহিত চুনি
বিন্যস্ত করেছি আমি দেবীর অধরে॥

প্রজ্বলিত ইন্দ্রনীলে খচিত নয়ন,
প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ,
মুকুতা-নির্মিত যুগ্ম ঘন-পীন-স্তন,
সুকঠিন পদ্মরাগে গঠিত চরণ।
অপূর্ব সুন্দর মূর্তি, কিন্তু অচেতন—
না পারি পূজিতে কিম্বা দিতে বিসর্জন!"

আমরা আমাদের যথাসর্বস্ব দিয়া, দেহপাত প্রাণপাত করিয়া, কত যত্ন ও আদরে আমাদের সাধ ও আশাকে গড়িয়া তুলি— কিন্তু হায়! যখন চেষ্টার শেষ অঙ্কে উপস্থিত হই, তখন যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা কোথায়? যে জন বা যে বস্তু পাইবার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াসে— জীবনসর্বস্বদান, তাহাকে তো পাইলাম না— অথচ যাহাকে সর্বস্ব দিয়াছি, তাহার চিন্তাই বা কী করিয়া ত্যাগ করি।

প্রায় সমস্ত সনেটগুলি এমন সুন্দর যে, উদ্ধৃত করিতে গেলে সমস্ত পুস্তক উদ্ধৃত করিতে হয়। ইহাতে কেবল একমাত্র আপত্তি, স্থানাভাব। সনেটগুলি

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। আমরা তাহাদের শ্রেণী নির্দেশ করিয়া এবং অল্পবিস্তর পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হইব।

গ্রন্থের প্রারম্ভে চারিটি সনেট সংস্কৃত সাহিত্যের চারি জন খ্যাতনামা কবির উপর লিখিত। যদিও তাহাদের অর্থ সংগ্রহ এবং সৌন্দর্য উপভোগের জন্য সেই-সকল কবিদের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে পাঠকের পূর্বপরিচয় কিয়ৎ-পরিমাণে আবশ্যক, কিন্তু তাহারা এমন সরল সাধারণভাবে লিখিত যে, পাঠে সকলেই তাহাতে মুগ্ধ হইবেন। "ভাস" ও "জয়দেবে"র উপর দুটি সনেটে পরস্পরের কাব্য-প্রকৃতির বিভিন্নতা দেখানো হইয়াছে। এতদিন আমরা ভাসের নামমাত্র শুনিয়া আসিতে-ছিলাম, সম্প্রতি তাঁহার কাব্যাবলী আবিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভাস সম্বন্ধে কবি বলেন—

"শুদ্ধ স্বরে গেয়েছিলে প্রসন্ন-বিভাস,
পরিষদ ছিল তব মহাপ্রাণ আর্য।
সে যুগের কবিমুখে ছিল না উচ্চার্য
বৃন্দাবনী প্রণয়ের গদগদ ভাষ॥

স্বাধ্যায়-পবিত্র তব শূর-মুখ-বাণী।
সরাগিণী অরোগিণী তব বীণাপাণি॥"

"চোরকবি" নামক সনেটটি সমুদয় না বুঝিলে গ্রন্থকারের উপর অন্যায় করা হয়। কিন্তু স্থানাভাবে ষষ্ঠকটি মাত্র উদ্ধৃত হইল—

"সেই রক্তপুষ্পে করি শক্তি-আরাধনা,
করেছিলে মশানেতে নায়িকা-সাধন।
দিয়েছিল দেখা বিশ্ব বিদ্যারূপ ধরি,
কনকচম্পকদামে সর্বাঙ্গ আবরি,
সুপ্তোত্থিতা, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরী,
প্রমাদের রাশিসম অবিদ্যা-সুন্দরী!"

কোনো চিত্রকরের তুলিকায় এমন সুন্দর লেখা কি সম্ভবপর? তুমি

সুপ্তোত্থিতা, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরীর ছবি ফলাইতে পারে। কিন্তু কোন্ বর্ণের অজানিত মহিমা দ্বারা— কোন্ দেহভঙ্গি এবং দৃষ্টিভঙ্গির নাট্য-কৌশলময় রেখাপাতে "প্রমাদের রাশিসম অবিদ্যা-সুন্দরী"কে আঁকিবে? মিল্টনের "Darkness Visible" মনশ্চক্ষে যে ছবি আঁকিয়া দেয়, কোন্ বর্ণে তাহা প্রতিফলিত করিবে?— বর্ণ ও রেখার অপেক্ষা শব্দের ব্যঞ্জনা-শক্তি অশেষ গুণে অধিক। শব্দের শক্তি অসীম। "শব্দ ব্রহ্ম"। "বসন্তসেনা" ও "পত্রলেখা"র পূর্ণ রসাস্বাদনের পক্ষে, পূর্বে "মৃচ্ছকটিক" এবং "কাদম্বরী"র পরিচয় আবশ্যক। এই দুই সনেটে উক্ত দুইটি সুন্দর কাব্যের মধুময়ী দুটি পাত্রী, কবির স্মৃতিময়ী কল্পনা-স্পর্শে মধুরতর রূপে প্রতিভাত। "বসন্তসেনা"য় কিন্তু সনেটের কোনো নিয়মই রক্ষিত হয় নাই। "পত্রলেখা" আরম্ভেই চিত্ত আকর্ষণ করে।

"অষ্টাদশ বর্ষ দেশে আছ পত্রলেখা"—

আমরা যখন তাহাকে প্রথম দেখি, তখন তাহার অষ্টাদশ পরিমিত যৌবন। তার পর আর কোনো সংবাদই পাই নাই। সুতরাং যখনই তাহাকে মনে পড়ে, তখনই তাহার সেই অষ্টাদশ বর্ষের উজ্জ্বল যৌবন-মাধুরী হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। যে ভূভাগে অষ্টাদশবর্ষ নিত্য বিরাজিত— "যৌবনান্তং বয়ো যস্মিন্"— "পত্রলেখা" সেই দেশের নিত্যঅধিবাসিনী।

"রজনীগন্ধা" ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ফুলের উপর লিখিত সনেটগুলি বিচিত্র কল্পনার বর্ণগৌরবে এবং অভিনব ভাবের অকৃত্রিম সৌরভে ফুলেরই মতো সুন্দর। সকলগুলিই কবির সূক্ষ্ম রসানুভবশক্তির পরিচায়ক— তা "ফুলের নবাব" এবং "নবাবের ফুল" গোলাপেরই উপর, বা "রতিভর তনু" কাঠমল্লিকারই উপর লিখিত হউক! তন্মধ্যে "ধুতুরার ফুল" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমন অনেক বস্তু বা বিষয় আছে, যাহাদের ভিতর আমরা সাধারণত উপভোগ্য কিছুই দেখিতে পাই না, কেবল বিশেষ মনোধর্ম-বিশিষ্ট কবিগণ— Poe বা Baudelaire অসাধারণ কল্পনা-বলে এবং সূক্ষ্ম অনুভব-শক্তির প্রভাবে তাহাদের প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য দেখিতে পান, এবং সেই-সকল বস্তু বা বিষয়কে আমাদের পরিচিত উপভোগ্য বস্তু বা বিষয়ের সহিত অচিন্ত্যপূর্ব ভাবসূত্রে গাঁথিয়া দিয়া সাধারণ মানবচক্ষে এই

লুকানো সৌন্দর্যকে বিকশিত করিয়া দেন, এবং একটি অভিনব আনন্দের সৃষ্টি করেন। ধুতুরার ফুলের "গন্ধ হলাহল" নূতন উপভোগের বিষয়।

রাগরাগিণীর উপর লিখিত সনেটগুলিও ফুলের সনেটসমূহের ন্যায় সমান উৎকর্ষপ্রাপ্ত। তন্মধ্যে "পূরবী", বিশেষত্বে "ধুতুরার ফুলে"র তুল্য-প্রকৃতি।

"পরিচয়ে" প্রকৃত প্রেমের একটি বিশেষ ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমের গভীর এবং প্রগাঢ় অনুভব হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে পূর্বস্মৃতি আহরণ করিয়া প্রেমপাত্রকে পূর্বজন্মের সহিত গাঁথিয়া দেয়। প্রেমিক কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে পারে না যে, প্রেমের পাত্রের সহিত এইজন্মেই তাহার প্রথম পরিচয়। যে প্রেম এখন সমস্ত জীবন—সমস্ত অস্তিত্বকে ব্যাপ্ত এবং পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে পূর্বে একেবারে ছিল না, তাহার কল্পনাই অসম্ভব। প্রেমিক হৃদয় তাই গভীর এবং প্রগাঢ় অনুভবের উন্মাদনায় গাহিয়া উঠিয়াছে—

"তোমা-সনে ছিল জানি পূর্ব-পরিচয়—
মন কিন্তু যুগস্মৃতি করে না সঞ্চয়।"

রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।"

এবং পূর্বজন্মে অবিশ্বাসী খ্রীস্টান কবিও গাহিয়াছেন—

"Has this been thus before ?
And shall not thus time's eddying flight
Still with our lives and love restore
In deaths' despite,
And day and night yield one delight once more."

"উপদেশ" নামক সনেটে প্রমথবাবু "প্রিয় কবি" এবং "বড়ো কবি" হইবার দুরাশায় "উদ্বাহু-বামন" দিগকে তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাতে চিহ্নিতপৃষ্ঠ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন—

"কবিতার জন্মস্থান কল্পনার দেশ,
সে দেশ জানে না কিন্তু মোদের ভূগোল—
সত্যের সেখানে নেই কোনো গণ্ডগোল,
দেহ নেই সেই দেশে, শুধু আছে বেশ!"

পরবর্তী সনেটের বর্ণিত "স্বপ্ন-লঙ্কা" সেইরূপ একটি কল্পনার দেশ। সেইখানে,

"লীন হয়ে প্রিয়া-অঙ্কে, সুবর্ণ পালঙ্কে,
কলঙ্কের মতো রই জড়ায়ে শশাঙ্কে!"

"ব্যর্থ জীবন" নামক বিদ্রূপাত্মক সনেটটি সাধারণ বাঙালিবাবুর সুন্দর ছায়াচিত্র, silhouette।

আমরা "রজনীগন্ধা" সনেটের অপ্রশংসা করিয়াছি। অনেকটা সেইরূপ ভঙ্গি এবং ধরনে লিখিত হইলেও "ভুল" নামক সনেটটি ভাব ও রসের মহিমা ও মোহিনীতে অতুলনীয়—

"ভালো তোমা বেসেছিনু, মিছে কথা নয়।
যেদিন একেলা তুমি ছিলে মোর সাথী,
বকুলের তলে বসি, মনে মন গাঁথি।
—বকুলের গন্ধ বলো কতদিন রয়?

সেদিন পৃথিবী ছিল অন্ধকারময়,
ঘন মেঘে ঢেকেছিল নক্ষত্রের বাতি,
সে তিমির চিরেছিল বিদ্যুৎ-করাতি।
—বিদ্যুতের আলো কিন্তু কতক্ষণ রয়?

স্বপ্ন মোরা ভুলে যাই নিদ্রা গেলে টুটে,
সাদা চোখে সব দেখি নেশা গেলে ছুটে॥

নিভানো আগুন জানি জ্বলিবে না আর,
মনে কিন্তু থেকে যায় স্মৃতিরেখা তার—
হৃদিলগ্ন আমরণ পারিজাত-হার।
হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার!"

প্রবন্ধ নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। এখন মোটের উপর প্রমথবাবুর কবিতা ও রচনা-শক্তির সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিয়া সমালোচনার উপসংহার করিব। তৎপূর্বে আমাদের একটি নিবেদন আছে। এই প্রবন্ধে অনেক সনেটের বিশেষ উল্লেখ হইল না, পাঠকগণ এমন ভাবিবেন না, তাহারা কোনো অংশে উদ্ধৃতগুলির অপেক্ষা হীনগৌরব।

কবিতার যে তিনটি লক্ষণ মহাকবি Milton চিরকালের জন্য অভ্রান্তরূপে নির্বাচন করিয়াছেন—simple (সরল)—sensuous (বস্তুতন্ত্র) এবং impassioned (আবেগময়), এই তিনটি লক্ষণই প্রমথবাবুর সনেটগুলির মধ্যে দেখিতে পাই। তাঁহার ভাষা এবং ভঙ্গি যারপরনাই সরল এবং সহজ। তাঁহার ভাব যেমন অকৃত্রিম, পূর্ণ এবং পরিণত, তাঁহার ভাষাও সেইরূপ সরল, প্রাঞ্জল, এবং বাহুল্যহীন। তাঁহার সনেটগুলির ভিতর অস্পষ্ট বা জটিল কিছুই নাই। দিবালোকের ন্যায় সকলই স্পষ্ট—প্রত্যক্ষ। তাঁহার কবিতা sensuous অর্থাৎ শরীরী, রূপ-রস-বিশিষ্ট, ধরিবার এবং ছুঁইবার— কেবল অপরিণত ভাবের কুজ্‌ঝটিকা নয়। এবং impassioned— সমস্তই প্রবল ভাবের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত। পাঠক দেখিবেন, প্রমথবাবুর এমন কোনো কবিতা নাই— তিনি এমন কোনো শব্দই ব্যবহার করেন নাই, যাহা রূপ রস হীন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"হৃদয়ে জন্মিলে মোর ভাবের অঙ্কুর
উঠে না তাহার ফুল শূন্যেতে দুলিয়ে।"
"নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন!"
"বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার
তাহার কবিতা শুধু মনের বিকার।
এ কথা পণ্ডিতে বুঝে, মূর্খে লাগে ধন্ধ।"

শুধু পঙ্‌ক্তিতে নয়— উল্লেখযোগ্য সকল-কবিই— Homer হইতে Swinburn পর্যন্ত এবং বাল্মীকি হইতে অক্ষয়কুমার পর্যন্ত কার্যত তাঁহাদের কাব্যে এ কথার সমর্থন করিয়াছেন। এই "অশরীরী মনঃস্পন্দনে"র আতিশয্য হেতুই রূপ-রস অর্থাৎ Sensuousness-এর অভাবে Emerson-এর কবিতা সাহিত্যে আদর পায় নাই। রহস্যের বিষয় এই যে, সম্প্রতি আমাদের দেশে এমন এক সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা এতই নিরাকার-পরায়ণ এবং অরূপের পক্ষপাতী যে, তাঁহারা সাহিত্যে sensuousness কেন, senseএর গন্ধ পাইলেই ক্ষেপিয়া উঠেন। বোধ হয়, এই সাধু-সম্প্রদায় sensuous এবং sensual, এই দুই কথার অর্থবিভিন্নতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কবির কার্য শব্দ এবং বাক্য লইয়া। এখন দেখা যাক, প্রমথবাবুর এ বিষয়ে সৌভাগ্য কিরূপ। অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন কবি এবং মনীষী Coleridge বলেন—"Good prose is proper words in their proper places; good verse is—the most proper words in their proper places"— উপযোগী শব্দের যথাস্থানে সংস্থানই ভালো গদ্য— সর্বাপেক্ষা উপযোগী শব্দের যথাস্থানে সংস্থানই ভালো পদ্য। এখন শব্দ এবং শব্দ-সমষ্টি, বাক্যের উপযোগিতা কিসে?— ব্যঞ্জনায়। অর্থাৎ, শব্দ এবং বাক্যের আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত আভাসে। গদ্যের পক্ষে ইহা অতিমাত্রা। পদ্যে আমরা চাই প্রাঞ্জল বিবৃতি। তৎপক্ষে পরিমিতার্থ শব্দ এবং বাক্য আবশ্যক। আমি এমন বলিতেছি না যে, গদ্যে ব্যঞ্জনা-শক্তিবিশিষ্ট শব্দ এবং বাক্যের প্রবেশ নিষেধ। ইহার বাহুল্যই গদ্যের হীনতা-জনক। তাহাতে গদ্যের প্রাঞ্জলতা নষ্ট হইতে পারে। তবে যে গদ্য প্রবল ভাবের আবেগে উদ্দীপ্ত— অর্থাৎ যে গদ্য নিজের সীমানা অতিক্রম করিয়া পদ্যের সীমানা আক্রমণ করে, সে গদ্যে ব্যঞ্জনা-শক্তিবিশিষ্ট শব্দ এবং বাক্য আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে। শব্দের আর-একটি শক্তি, প্রকৃতির সৌন্দর্যে যে অব্যক্ত ইন্দ্রজাল বা মোহিনী আছে, তাহাকে প্রতিফলিত করা। এই অব্যক্ত ইন্দ্রজালকে ভাষায় আয়ত্ত এবং ব্যক্ত করাই কবির কার্য। একটি ভাবের জন্য— একটি বিষয়ের অঙ্কন

উপযোগী— একটি মাত্র অদ্বিতীয় কথাই আছে— যাহার সংস্পর্শে প্রণয়িণীর চুম্বনের ন্যায় (the very kiss of the beloved) ভাব জাগিয়া উঠে। এইরূপ কথা নির্বাচনে অদ্ভুত ক্ষমতা আমরা দেখিতে পাই— বিদ্যাপতি এবং অপর দুই-একটি বৈষ্ণব কবিতে, ভারতচন্দ্রে এবং রবীন্দ্রনাথে। প্রমথবাবুর অনেকগুলি সনেটেও এই শব্দসম্পদের নিদর্শন পাই।

আবার শব্দ অপেক্ষা স্বরের ব্যঞ্জনা-শক্তি অনেকগুণে অধিক। ভাব বা অনুভবের আবেগ ও গভীরতা, যাহা ভাষায় অপ্রাপ্য— স্বরের অপৌরুষেয় মহিমায় তাহা অনায়াসলভ্য। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের স্বর-সম্পদ আশ্চর্য। বিদ্যাপতির "সখী রে কি পুছসি অনুভব মোয়"— এই কয়টি সামান্য কথার প্রকাশ-শক্তি সামান্য,—কিন্তু ইহাদের ভিতর যে স্বরের অসামান্য আবেগ আছে— তাহাতে অনুভবের আবেগ পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। কয়টি কথার আকুল স্বরে আমরা প্রেমবিহ্বল-হৃদয়ের অশ্রুময়ী আকুলতা আমাদের নিজ হৃদয়ে অনুভব করি। যে প্রেম জীবনমরণকে আত্মসাৎ করিয়া রহিয়াছে— যাহার উল্লেখমাত্র হৃদয় বিবশ— নয়নপত্র আর্দ্র হয়— সেই প্রেমের করুণ-চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠে। পাঁচটি মাত্র কথা। কিন্তু এমন অশ্রু-সিক্ত পদ আর দ্বিতীয় কোথায়?

প্রমথবাবুর রচনার আর-একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার কবিতায় এমন অনেক কথা পাওয়া যায়, যাহা প্রবাদ-বচনের ন্যায় শাণিত— সংক্ষিপ্ত এবং জীবনের অনেক বিষয়ে লাগাইবার উপযোগী— যাহাকে Matthew Arnold —criticism of life—জীবনঘটিত ব্যাপারের আলোচনা বলেন, এবং প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে সেক্ষপীয়ার এবং কালিদাসের অসাধারণ সৌভাগ্য। তাঁহাদের নীচে পোপের নাম করা যাইতে পারে। প্রমথবাবু নিজেই বলিয়াছেন, ভাষার এই চুট্‌কি সম্পত্তির দিকে তাঁহার আন্তরিক টান—

> "আজ তাই ছাড়ি যত ধ্রুপদ ধামার,
> চুট্‌কিতে রাখি যত আশা ভালোবাসা।"

প্রমথবাবুর পুস্তকে আমরা উচ্চ প্রতিভার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ এবং বিস্তারিত সাহিত্যানুশীলনের পরিচয় পাই। প্রতিভার প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার এবং ললিতকলাচর্চার প্রণোদনা দেখি। তিনি স্বভাব-কবি— তাঁহার নিজের খাঁটি বাংলায় "জাত-কবি"—হইলেও কেবলমাত্র বাগ্‌দেবীর "ভর" লইয়া না থাকিয়া নিজের স্বাভাবিক শক্তিসমূহকে বিস্তর অনুশীলনে কর্ষিত করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার সুন্দর কলাসৌষ্ঠব এই অনুশীলনের ফল। তিনি কবি এবং—Artist—কলানিপুণ। এবং উহারই বলে 'সনেট-পঞ্চাশৎ' তাঁহার প্রথম পুস্তক হইলেও তাহাতে আমরা শিক্ষানবীশের অনুচিকীর্ষা, অসম্পূর্ণতা বা অক্ষমতা কোথাও দেখিলাম না। সমস্তই পাকা হাতের লেখা। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের রচনার সঙ্গে বহু এবং বহুকালব্যাপী পরিচয় থাকার দরুন ললিতকলার সকল অঙ্গই তাঁহার সুপরিচিত। লিখিতে বসিয়া তাঁহাকে আদর্শহীন হইতে বা আদর্শের জন্য হাতড়াইতে হয় নাই। বিস্তারিত সাহিত্য-চর্চার ফলে যে কলাসৌন্দর্য অতর্কিতভাবে তাঁহার হৃদয়ে গভীর অঙ্কপাত করিয়াছে, তাহাকে তাঁহার সাহিত্যিক "সংস্কার" বলা যাইতে পারে। এই সংস্কারপুষ্ট প্রতিভাবলে তাঁহার সনেটগুলি, কল্পনাসম্পদে—ভাবপ্রকাশে—ভাষা ও ভঙ্গিগৌরবে এবং শ্রুতিমাধুর্যে এক রবিবাবু ছাড়া সমসাময়িক কোনো কবির রচনা অপেক্ষা হীনশ্রী নহে।

সাহিত্য। শ্রাবণ ১৩২০ শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

৫

সনেট কেন চতুর্দশপদী

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন গত মাসের "সাহিত্য" পত্রিকায় 'সনেট-পঞ্চাশৎ' নামক পুস্তিকার সমালোচনা সূত্রে, সনেটের আকৃতি এবং প্রকৃতির বিশেষ পরিচয় দিয়ে এই মত প্রকাশ করেছেন যে—"খুব সম্ভব কলাপ্রবীণ ইতালীয় ও অপরদেশীয় কবিরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, পূর্ণ-রসাভিব্যক্তির পক্ষে চতুর্দশপদই সমীচীন, এবং তাহাই সাহিত্য-সংসারে চলিয়া আসিয়াছে।"

নানা যুগে নানা দেশে নানা কবির হাতে ফিরেও সনেট যে নিজের আকৃতি ও রূপ বজায় রাখতে পেরেছে, তার থেকে এই মাত্র প্রমাণ হয় যে, সনেটের ছাঁচে নানারূপ ভাবের মূর্তি ঢালাই করা চলে, এবং সে ছাঁচ এতই টেঁকসই যে বড়ো বড়ো কবিদেরও ভাবের জোরে সেটি ভেঙেচুরে যায় নি। কিন্তু সনেট যে কেন চতুর্দশপদ গ্রহণ করে জন্মলাভ করলে সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। অথচ অঙ্গীকার করা যায় না যে, বারো কিম্বা ষোলো না হয়ে, সনেটের পদসংখ্যা যে কেন চৌদ্দ হল, তা জানবার ইচ্ছে মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কী কারণে সনেট চতুর্দশপদী হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার একটি মত আছে, এবং সে মত কেবলমাত্র অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার স্বপক্ষে কোনোরূপ অকাট্য প্রমাণ দিতে আমি অপারগ। স্বদেশী কিম্বা বিদেশী কোনোরূপ ছন্দ-শাস্ত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই—পিঙ্গল কিম্বা গৌর কোনো আচার্যের পদসেবা আমি কখনো করি নি। সুতরাং আমার আবিষ্কৃত সনেটের "চতুর্দশীতত্ত্ব" শাস্ত্রীয় কিম্বা অশাস্ত্রীয়, তা শুধু বিশেষজ্ঞেরাই বলতে পারবেন।

চৌদ্দ কেন?—এ প্রশ্ন সনেটের মতো বাংলা পয়ার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। এর একটি সমস্যার মীমাংসা করতে পারলে অপরটির মীমাংসার পথে আমরা অনেকটা অগ্রসর হতে পারব।

আমার বিশ্বাস, বাংলা পয়ারের প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা চতুর্দশ হবার

একমাত্র কারণ এই যে, বাংলা ভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ শব্দ হয় তিন অক্ষরের নয় চার অক্ষরের। পাঁচ-ছয় অক্ষরের শব্দ প্রায়ই হয় সংস্কৃত নয় বিদেশী। সুতরাং সাত অক্ষরের কমে সকল সময়ে দুটি শব্দের সমাবেশের সুবিধা হয় না। সেই সাতকে দ্বিগুণ করে নিলেই শ্লোকের প্রতি চরণ যথেষ্ট প্রশস্ত হয়, এবং অধিকাংশ প্রচলিত শব্দই ওই চৌদ্দ অক্ষরের মধ্যেই খাপ খেয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আমাদের ভাষায় দু অক্ষরের শব্দের সংখ্যাও কিছু কম নয়। কিন্তু সে-সকল শব্দকে চার অক্ষরের শব্দের সামিল ধরে নেওয়া যেতে পারে— যেহেতু দুই স্বভাবতই চারের অন্তর্ভূত।

এই চৌদ্দ অক্ষর থাকবার দরুনই বাংলা ভাষায় কবিতা লেখবার পক্ষে পয়ারই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। একটানা লম্বা কিছু লিখতে হলে, অর্থাৎ যাতে অনেক কথা বলতে হবে এমন কোনো রচনা করতে গেলে, বাঙালি কবিদের পয়ারের আশ্রয় অবলম্বন ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কৃত্তিবাস থেকে আরম্ভ করে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত, বাংলার কাব্য-নাটক-রচয়িতা মাত্রই পূর্বোক্ত কারণে, অসংখ্য পয়ার লিখতে বাধ্য হয়েছেন, এবং চিরদিনের জন্য বাঙালির প্রতিভা ওই পয়ারের চরণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে।

পয়ারে চতুর্দশ অক্ষরের মতো, সনেটে চতুর্দশ পদের একত্র সংঘটন, আমার বিশ্বাস, অনেকটা একই কারণে একই রকমের যোগাযোগ সিদ্ধ হয়েছে।

বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে জীবজগৎ এবং কাব্যজগতের ক্রমোন্নতির নিয়ম পরস্পরবিরুদ্ধ। জীব উন্নতির সোপানে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ক্রমিক পদলোপ হয়, কিন্তু কবিতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পদবৃদ্ধি হয়। পদ্য দুটি চরণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে; দ্বিপদীই হচ্ছে সকল দেশে সকল ভাষার আদিচ্ছন্দ। কলিযুগের ধর্মের মতো, অর্থাৎ বকের মতো, কবিতা একপায়ে দাঁড়াতে পারে না।

এই দ্বিপদী হতেই কাব্যজগতের উন্নতির দ্বিতীয় স্তরে ত্রিপদীর আবির্ভাব হয়, এবং ত্রিপদী কালক্রমে চতুষ্পদীতে পরিণত হয়। কবিতার পদবৃদ্ধির এই শেষ সীমা। কেন? সে কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। আমরা যখন মিল-

প্রধান সনেটের গঠন-রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে বসেছি, তখন মিত্রাক্ষরযুক্ত দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর আকৃতির আলোচনা করাটাই আমাদের পক্ষে সংগত হবে। অমিত্রাক্ষর কবিতা কামচারী, চরণের সংখ্যা-বিশেষের উপর তার কোনো নির্ভর নেই, তাই কোনোরূপ অঙ্কের ভিতর তাকে আবদ্ধ রাখবার জো নেই।

দ্বিপদীর চরণ দুটি পাশাপাশি মিলে যায়। ত্রিপদীর প্রথম দুটি চরণ দ্বিপদীর মতো পাশাপাশি মেলে, তৃতীয় চরণটি অপর একটি চরণের অভাবে আলগাভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং অপর একটি ত্রিপদীর সান্নিধ্য লাভ করলে তার তৃতীয় চরণের সঙ্গে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হয়। বাংলা সংস্কৃত ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষার ত্রিপদীর আকৃতি ও প্রকৃতি এইরূপ; কিন্তু ইতালীয় ত্রিপদীর গঠন স্বতন্ত্র।

ইতালীয় ত্রিপদীর প্রথম চরণের সহিত তৃতীয় চরণের মিল হয়, এবং দ্বিতীয় চরণ মিলের জন্য পরবর্তী ত্রিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে। ইতালির ত্রিপদী তিন চরণেই সম্পূর্ণ। ভাব এবং অর্থ বিষয়ে একটির সহিত অপরটি পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন। পূর্বাপর যোগ কেবলমাত্র মিল-সূত্রে রক্ষিত হয়। একটি কবিতার ভিতর, তা যতই বড়ো হোক-না কেন, সে যোগের কোথাও বিচ্ছেদ নেই। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত, একটি কবিতার অন্তর্ভূত ত্রিপদীগুলি এই মিলনসূত্রে গ্রথিত, এবং ইস্ক্রুর (Screw) পাকের ন্যায় পরস্পরযুক্ত। নিম্নে Robert Browning-রচিত "The Statue and the Bust" নামক কবিতা হতে, ইতালীয় ত্রিপদীর নমুনাস্বরূপ ছয়টি চরণ উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি।* পাঠক দেখতে

---

* There's a place in Florence, the world know's well,
And a Statue watches it from the Square,
And this Story of both do our townsmen tell.

Ages ago, a lady there,
At the farthest window facing the East,
Asked, 'Who rides by with the royal air ?'

পাবেন, যে প্রথম ত্রিপদীর মধ্যম চরণটি মিলের জন্য দ্বিতীয় ত্রিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে।

অর্থাৎ ত্রিপদীর বিশেষত্ব হচ্ছে দুটি চরণ পাশাপাশি না মিলে, মধ্যস্থ একটি কিম্বা দুটি চরণ ডিঙিয়ে মেলে। ত্রিপদীর এই মিলের ক্ষণিক বিচ্ছেদ বক্ষে করে চারটি চরণের মধ্যে দুজোড়া মিলকে স্থান দেবার ইচ্ছে থেকেই চতুষ্পদীর জন্ম! দুটি দ্বিপদী পাশাপাশি বসিয়ে দিলে চতুষ্পদী হয় না। চতুষ্পদীতে প্রথম চরণ হয় তৃতীয় চরণের সঙ্গে নয় চতুর্থ চরণের সঙ্গে মেলে, আর দ্বিতীয় চরণ হয় তৃতীয় নয় চতুর্থের সঙ্গে মেলে। এক কথায় চতুষ্পদীর আকৃতি দ্বিপদীর এবং প্রকৃতি ত্রিপদীর।

আমি পূর্বেই বলেছি যে দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদীই পদ্যের মূল উপাদান। বাদ বাকী যত-প্রকার পদ্যের আকার দেখতে পাওয়া যায়, সে-সবই দ্বিপদী, ত্রিপদী এবং চতুষ্পদীকে হয় ভাঙচুর করে নয় জোড়াতাড়া দিয়ে গড়া ;— এ সত্য প্রমাণ করবার জন্য বোধ হয় উদাহরণ দেবার আবশ্যক নেই।

কবিতার পূর্ববর্ণিত ত্রিমূর্তির সমন্বয়ে একমূর্তি গড়বার ইচ্ছে থেকেই সনেটের সৃষ্টি— সেই কারণেই সনেট আকৃতি হিসাবে "সমগ্রতা একাগ্রতা" এবং সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। ত্রিপদীর সঙ্গে চতুষ্পদীর যোগ করলে সপ্তপদ পাওয়া যায়, এবং সেই সপ্তপদকে দ্বিগুণিত করে নেওয়াতেই সনেট চতুর্দশপদ লাভ করেছে। এই চতুর্দশ পদের ভিতর দ্বিপদী ত্রিপদী এবং চতুষ্পদী তিনটিরই স্থান আছে, এবং তিনটিই সমান খাপ খেয়ে যায়।

পেত্রার্কার সনেটের অষ্টক পরস্পর মিলিত এবং একাঙ্গীভূত দুটি যমজ চতুষ্পদীর সমষ্টি ; এবং প্রতি চতুষ্পদীর অভ্যন্তরে একটি করে আস্ত দ্বিপদী বিদ্যমান। ষষ্ঠকও ওইরূপ দুটি ত্রিপদীর সমষ্টি। ফরাসি সনেটও ওই একই নিয়মে গঠিত, উভয়ের ভিতর পার্থক্য শুধু ষষ্ঠকের মিলের বিশিষ্টতায়। ফরাসি ভাষায় ইতালীয় ভাষার ন্যায় পদে পদে ছত্রব্যবধান দিয়ে চরণে চরণে মিলন সাধন করা স্বাভাবিক নয় ; সেইজন্য ফরাসি সনেটে ষষ্ঠকের প্রথম দুই চরণ দ্বিপদীর আকার ধারণ করে।

গ্রন্থপরিচয়

সনেট ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর যোগে ও গুণে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে চতুর্দশপদী হতে বাধ্য।

ভারতী। ভাদ্র ১৩২০ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

৬

পাঠ-প্রসঙ্গ

পদচারণের "খেয়ালের জন্ম" কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ তার প্রশংসা করে একটি ছত্রের পরিবর্তন প্রস্তাব করেন—

পোষ্টমার্ক ৬ জুলাই ১৯১৪

"তোমার কবিতাটি আমার খুব ভাল লাগল। রসও যেমন, নৈপুণ্যও তেমনি, আর ভাষাটি সম্পূর্ণ তোমার নিজের। কেবল একটা লাইন আমার মনে হল যে একটু বদলালে ভাল হয়। সম্ভবত "পারদ" শব্দটার কোনো একটা বিশেষ অর্থ আছে— যদি তা থাকেও তবু সেটা সর্ব্বজনগম্য নয়— আর যদি তুমি থার্ম্মমিটরের পারার প্রতি লক্ষ্য করে থাক সেটা বেশ লাগসই হচ্চে না— কারণ পারা কোনো কিছুকে আক্রমণ করলে সেটা কেবল মারাত্মক হতে পারে মানুষের শরীর সম্বন্ধে— স্বর্গের দেয়ালের পরে তার ক্রিয়াটা অনুভবগোচর না হবার কথা। যদি এই রকম কর ত কেমন হয়—

শিকল ছিঁড়িয়া সুর ভাঙিয়া গারদ
শূন্যে ছুটি আক্রমিল স্বর্গের দেয়াল ইত্যাদি।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ৫, পৃ ১৭৩। প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র।

প্রমথ চৌধুরী এই পরিবর্তন স্বীকার করে কবিতাটি সবুজ পত্রে প্রকাশ করেন।

পদচারণের একটি কবিতার একটি ছত্রের পাঠ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন—

সনেট-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত "কবিতা"র প্রথম ছত্র

কবিতা লিখেছি শখে, হয়েছে কসুর।

মানসী পত্রে ও তার অনুবৃত্তিতে পদচারণের প্রথম সংস্করণে এইভাবে মুদ্রিত—

কবিতা লিখেছি সখি, হয়েছে কসুর।

পাণ্ডুলিপিতে ছত্রটি এইভাবে লিখিত আছে—

কবিতা লিখেছি সখে, হয়েছে কসুর।

সখে=শখে (আধুনিক বানান) সখার সম্বোধন পদ সখে নয়, এই অনুমানে সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতায় শখে পাঠ গৃহীত হয়েছে। সম্পূর্ণ কবিতাটির দ্বারাও সম্ভবত এই অনুমান সমর্থিত হবে।

৭

প্রসঙ্গ-কথা

কোনো-কোনো কবিতার প্রসঙ্গ বর্তমানে তেমন সুপরিচিত না হতে পারে এই অনুমানে এখানে তার উল্লেখ করা হল।

বিলাতে রবীন্দ্র। ১৯১২ সালে বিলাতপ্রবাসকালে সাহিত্যিকসমাজে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার বিবরণ এ দেশে পৌঁছলে এই কবিতা লিখিত।

The Book of Tea। জাপানী মনীষী ওকাকুরার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (প্রকাশ ১৯০৬)। ওকাকুরা বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় যখন ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসেন তখন ঠাকুর- ও চৌধুরী- পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা জন্মেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল। সুহৃৎ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুর (১৭ মে ১৯১৩) পরে লিখিত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রমথ চৌধুরীর এই-সকল রচনায় দ্বিজেন্দ্র-কথা আলোচিত হয়েছে— 'সাহিত্যে চাবুক', সাহিত্য, মাঘ ১৩১৯, বীরবলের হালখাতা গ্রন্থের অন্তর্গত; 'দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিসভায় কথিত', সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ এবং 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান' সবুজ পত্র, আষাঢ় ১৩২৩।

দোপাটি। এই কবিতাগুচ্ছের আটটি 'দোপাটি' সম্বন্ধে দার্জিলিং থেকে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি পত্রে (২৭ অক্টোবর ১৯১৩) প্রমথ চৌধুরী লেখেন—

…আমার এখানে কোন কাজ নেই— অথচ কিছু করবারও অবসর নেই। লেখাপড়া কিছুই করছিনে। শুধু মাঝে মাঝে "গাথা সপ্তশতী" থেকে দু' একটি শ্লোক বাঙ্গালায় তরজামা করি। আজ প্রায় দু হাজার বৎসর আগে সাতবাহন ভূপতি "হাল" সাতশ প্রাকৃত শ্লোক সংগ্রহ করেন— সেই সংগ্রহ গাথা সপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ। এতকাল পূর্বে এদেশের লোকের মনোভাবের এ কালের মনোভাবের সঙ্গে কতটা ঐক্য আছে দেখে আশ্চর্য্য

হতে হয়। আমি নমুনা-স্বরূপ কটি শ্লোক লিখে পাঠাচ্ছি পড়ে দেখো। এগুলি ছাপাবার জন্য নয়। ইতি—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

স্নেহলতা। 'একটি ১৪ বছরের মেয়ের একজন "শিক্ষিত" যুবকের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হয়। ছেলের বাবা যে পণ চায়, মেয়ের বাবা তাহার সমস্তটা যোগাড় করিতে না পারিয়া শেষে নিজের বসতবাটীটি পর্যন্ত বন্ধক দিবার বন্দোবস্ত করেন। তাহার বিবাহের জন্য পিতামাতা সর্বস্বান্ত ও গৃহহারা হইতেছেন, এই চিন্তা বালিকাকে ব্যাকুল করে। সে বাপমাকে ঘোর দারিদ্র্যদুঃখ হইতে মুক্তি দিবার জন্য আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে'।[১] স্নেহলতার আত্মহত্যার ফলে এই সময় বাঙালি-সমাজে পণপ্রথার বিরুদ্ধে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল— দেশবাসীর মর্মবেদনা ব্যক্ত হয়েছিল বহু প্রবন্ধে ও একাধিক কবিতায়, যথা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা 'মৃত্যু-স্বয়ম্বর', প্রবাসী, চৈত্র ১৩২০।

ছোটো কালীবাবু। প্রমথ চৌধুরীর ভ্রাতা কুমুদনাথ চৌধুরীর পুত্র কালীপ্রসাদ। ইনি প্রমথ চৌধুরীর পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন ছিলেন। ১৯৪১ সালে ১৭ জুন বিমানযুদ্ধে নিহত হন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'গল্প-সংগ্রহ' গ্রন্থ (৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১) কালীপ্রসাদের স্মৃতিতে উৎসর্গ করে লিখেছেন—

তোমার বয়স যখন আড়াই বৎসর তখন তোমার নামে এই Triolet-টি লিখি···

আর আজ ?—

স্ত্রিয়ো হি বিষয়ঃ শুচাম্। তথাপি কিং করোমি।
স্বভাবস্য মেয়ং কাপুরুষতা বা স্ত্রৈণং বা যদেবমাস্পদং
পুত্রশোকহুতভুজো জাতোঽস্মি।

তোমার ন-কাকা

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১ প্রমথ চৌধুরী

১ বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২০

সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী

সনেট-পঞ্চাশৎ

সনেট। ভারতী। অগ্রহায়ণ ১৩১৯
ভর্তৃহরি। ভারতী। অগ্রহায়ণ ১৩১৯
ব্যর্থ-বৈরাগ্য। ভারতী। অগ্রহায়ণ ১৩১৯
পত্রলেখা। ভারতী। অগ্রহায়ণ ১৩১৯
শিখা ও ফুল। সাহিত্য। ফাল্গুন ১৩১৯
গোলাপ[১]। সাহিত্য। পৌষ ১৩১৯
অন্বেষণ। সাহিত্য। পৌষ ১৩১৯

পদচারণ

পূর্ণিমার খেয়াল। ভারতী। মাঘ ১৩১৯
সনেট-সুন্দরী। ভারতী। ভাদ্র ১৩২০
অকালবর্ষা। প্রবাসী। আষাঢ় ১৩২০, 'বর্ষা' ২
বর্ষা। প্রবাসী। আষাঢ় ১৩২০, 'বর্ষা' ১
সনেট-চতুষ্টয়। মানসী। আষাঢ় ১৩২১
সনেট-সপ্তক। ভারতী। আষাঢ় ১৩২০
বর্ষা[২]। সন্দেশ। আষাঢ় ১৩২১
কৈফিয়ত। ভারতী। আশ্বিন ১৩২০
পত্র। সাহিত্য। শ্রাবণ ১৩২০
দোপাটি। মানসী। ফাল্গুন ১৩২০[৩]
দুয়ানি। ভারতী। অগ্রহায়ণ ১৩২০
বনফুল[৪]। ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

চেরি-পুষ্প। ভারতী। চৈত্র ১৩২০
ভালো তোমা বাসি যখন বলি। ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
প্রেমের খেয়াল। ভারতী। বৈশাখ ১৩২১
দ্বিজেন্দ্রলাল। সাহিত্য। ভাদ্র ১৩২০
স্নেহলতা। সাহিত্য। ফাল্গুন ১৩২০
খেয়ালের জন্ম। সবুজ পত্র। আষাঢ় ১৩২১
তেপাটি[৫]। সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২১
সনেট। সবুজ পত্র। আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৩
শরৎ। সবুজ পত্র। আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪
সংসার। সাহিত্য। ভাদ্র ১৩২১
ছোটো কালীবাবু[৬]। সবুজ পত্র। শ্রাবণ ১৩২৫

অন্যান্য কবিতা

পঞ্চাশোর্ধ্বে[৭]। বিশ্বভারতী পত্রিকা। বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৫৪
সনেট। ঋতুপত্র। বর্ষা ১৩৬২
উত্তর। ঋতুপত্র। শীত ১৩৬২
কাঠের রাজা[৮]। বিশ্বভারতী পত্রিকা। মাঘ ১৩৪৯

গান। আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা। আষাঢ় ১৩২১

এই তালিকায় অসম্পূর্ণতা থাকা সম্ভব।

১ ‘অপরাহ্ন’ নামে।
২ ‘আষাঢ়ে ছড়া’ নামে
৩ রত্নকণিকা নামে। প্রথম কবিতাটি মানসীতে প্রকাশিত হয় নি।
৪ ‘বঙ্গে হইতে পত্রাভ্যন্তরে আগত বনফুলের প্রতি’ নামে।
৫ ‘সবুজ পত্রে “অনার্য বাঙালী” নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র

[কুমার] বসু আই. সি. এস. বাংলায় একটি Triolet রচনা করে নমুনাস্বরূপ সেটি আমাকে পাঠিয়ে দেন। সেই নমুনা-অনুসারে আমি এই কবিতাগুলি লিখেছি। "তেপাটি" নামও তাঁরই দত্ত। সুতরাং এই কবিতাগুলির নাম ও রূপের জন্য আমি তাঁর নিকট সম্পূর্ণ ঋণী। প্র. চৌ.।'—সবুজ পত্রে কবিতার পাদটীকা।

৬ ফরাসী কবিতা Triolet-এর ছাঁচে ঢালাই করে আমি এক সময়ে গুটি-ছয়েক পদ্য রচনা করি এবং তার নাম দিই তেপাটি। সে-সকল তেপাটিতে Triolet-এর ঠিক গড়নটি বজায় রাখতে পারি নি। হাত-দুই জমির ভিতর কুঁচিমোড়া ভাঙা যে কি কঠিন ব্যাপার, তা যিনি কখনো কসরত করেছেন তিনিই জানেন। তেপাটি লেখাও হচ্ছে লেখনীর একটা কসরত। Triolet অষ্টপদী কবিতা। এই আট পদের ভিতর, প্রথম পদটি ধুয়ো হিসেবে আব দু'বার, আর দ্বিতীয় পদটি আর একবার দেখা দেয়। তা ছাড়া এ পদ্যের ভিতর শুধু একজোড়া মিল আছে। প্রথম তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম আর সপ্তম পদ একসঙ্গে মেলে; বাকি তিন পদ একসঙ্গে মেলে। বলা বাহুল্য এ কবিতার ভাব ভাষা দুই-ই নেহাত হালকা হওয়া চাই। —সবুজ পত্রে কবিতার পাদটীকা।

৭ বিশ্বভারতী পত্রিকা ও এই গ্রন্থে কবিতাটির যে নাম দেওয়া হয়েছে তা লেখক-প্রদত্ত নয়।

৮ প্রথম চৌধুরীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই পত্রাংশ থেকে রচনাটির তারিখ অনুমান করা যেতে পারে— 'তোমার সেই কাঠের পুতুলটাতে একবার হাত দিলে কেমন হয়?' [২৩ এপ্রিল ১৯১৫], "চিঠিপত্র" ৫।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

এই গ্রন্থের 'অন্যান্য কবিতা' অংশে যে-সব কবিতা মুদ্রিত হয়েছে তার অধিকাংশ লেখকের কবিতার খাতা থেকে সংগৃহীত। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী এই খাতাটি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। এর কোনো-কোনো কবিতা তিনি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনের পর সাময়িক পত্রে প্রকাশও করেছিলেন; 'কাঠের রাজা' 'বীরবল' নিজেই জীবিতকালে প্রকাশ করেন, যথাস্থানে এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্যও মুদ্রিত হয়েছে।

এই বিভাগে যে গানটি সংকলিত হয়েছে সে-প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ-যোগ্য। প্রমথ চৌধুরী সাধারণ অর্থে গানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, তবে, তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে, 'সংগীতের প্রতি আমার আবাল্য অনুরাগ' ছিল; 'বাল্যকালে আমার কান তৈরি হয়েছিল···ওস্তাদী ঢঙের গানে'; 'আমি অল্পবয়স থেকেই গান গাইতুম··· কানে যে সুর আসত গলায় তা বদলি হত।' সবুজ পত্রে যখন সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা ও বাদানুবাদ চলেছিল তখন স্বনামে ও 'বীরবল' ছদ্মনামে তাতে যোগ দিয়েছিলেন, সেই-সময়কার দুটি লেখা 'হিন্দুসংগীত' নামে পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছে। দু-একটি গানও তিনি রচনা করেছিলেন তারই একটি নিদর্শন এই সংকলনে রক্ষিত হল। স্বরলিপিসহ এটি আনন্দসঙ্গীত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রচনার খাতা অনুযায়ী গানটির রাগিণী কানাড়া বলে এই গ্রন্থে উল্লিখিত, কিন্তু ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী মেঘমল্লার রাগিণীতে এটির সুর দেন।

পূর্বোল্লিখিত খাতাটি থেকে অনেকগুলি কবিতা রচনার তারিখ ও স্থান এই সংস্করণে যোগ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের পূর্বকথা অংশ দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, এই সময় শ্রীরেণুকা দেবী একটি গুরুতর মুদ্রণপ্রমাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি সংকলয়িতার কৃতজ্ঞতাভাজন। লেখকের-জীবিতকালে-অপ্রকাশিত কবিতার নির্বাচনে শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শ্রীকানাই সামন্তের পরামর্শ ও মুদ্রণকর্মে শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সযত্ন সহকারিতা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থপরিচয়ের প্রথম অধ্যায়ে প্রিয়নাথ সেন ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক লিখিত যে সনেট-পঞ্চাশৎ-সমালোচনার উল্লেখ আছে বর্তমান সংস্করণে সে দুটি সংকলিত হল। প্রিয়নাথ সেনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে আলোচনাসূত্রে প্রমথ চৌধুরী যে 'সনেট কেন চতুর্দশপদী?' প্রবন্ধটি লেখেন প্রসঙ্গসূত্রে সেটিও এই সংস্করণে গ্রথিত হল।

বর্তমান সংস্করণে সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচীর পাদটীকায় দোপাটি কবিতাগুচ্ছ সম্পর্কে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত প্রমথ চৌধুরীর একটি চিঠি যুক্ত হয়েছে। শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে এই চিঠি প্রকাশিত।

'আজি সহসা বরষা এল' গানটির ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী-কৃত স্বরলিপিও সংকলিত হল।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ এবং পদচারণ কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত তাঁর পত্র শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়ের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

বর্তমান সংস্করণের নূতন উপকরণ সংকলনে শ্রীশঙ্খ ঘোষের পরামর্শ পেয়ে সম্পাদক উপকৃত হয়েছেন।

পূর্ব সংস্করণের মুদ্রণকর্মে শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সহকারিতা বর্তমান সংস্করণেও অক্ষুণ্ণ।

প্রথম ছত্রের সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী